সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৫

হরিনাথ মজুমদার

(কাঙ্গাল হরিনাথ)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৫

হরিনাথ মজুমদার

(কাঙ্গাল হরিনাথ)

১৮৩৩—১৮৯৬

হরিনাথ মজুমদার

(কাঙ্গাল হরিনাথ)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৫০

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

৩—২৯।১১।১৯৪৩

জন্ম ; বাল্য-জীবন

১২৪০ সালের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৩৩) নদীয়ার অন্তঃপাতী কুমারখালী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত তিলি-পরিবারে হরিনাথ মজুমদারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—হলধর মজুমদার। হরিনাথের বাল্য-জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-দারিদ্র্যে পূর্ণ। তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :—

> যখন আমার বয়স এক বৎসর অতিক্রম করে নাই, তখন মাতৃদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমি মাতৃহীন হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় যে কত কাঁদিয়াছি, তাহা কে বলিতে পারে? খুল্লপিতামহী আমাকে প্রতিপালন করেন। আমার পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু বোধ হয় তন্নিমিত্তই সংসারে উদাসীন ছিলেন। তিনি বিষয়কার্য্যে তাদৃশ মনোযোগ বিধান না করায়, পৈতৃক সম্পত্তি যাহা ছিল, তৎসমুদায়ই নষ্ট হয়। সুতরাং মাতৃবিয়োগ হইতেই সাংসারিক দুঃখ যে আমার সহচর হইয়াছে, সে কথা বলা বাহুল্য। বাল্যখেলার সময় অন্য বালকেরা ক্রীড়োপযোগী বস্তু পিতা মাতার নিকটে সহজে পাইয়া আনন্দ করিয়াছে, আমি তন্নিমিত্ত ক্রন্দন করিয়া মাটি ভিজাইয়াছি; এই অবস্থায় কতক দিন গত হয়। পরে বিদ্যাভ্যাসের সময় উপস্থিত হইল। পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন, নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া কত কাঁদিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সময় কুমারখালীনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয়

একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নের নিমিত্ত তাহাতে প্রবেশ করিলাম। খুল্লতাত শ্রীযুক্ত নীলকমল মজুমদার মহাশয় পুস্তকাদির ব্যয় ও স্কুলের বেতন সাহায্য করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কর্ম্ম গেল। অর্থাভাবে আমারও লেখাপড়া বন্ধ হইল। স্কুলের হেডমাষ্টার কৃষ্ণধন বাবু বিনা বেতনে কতক দিন শিক্ষা দিয়াছিলেন; কিন্তু অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ ও পুস্তকাদির অসদ্ভাবে আমাকে অধিক দিন বিদ্যালয়ে তিষ্ঠিয়া থাকিতে দিল না।

স্বদেশ-সেবা

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

বাল্যকালে আশানুরূপ শিক্ষালাভ করিতে না পারায় হরিনাথের মনে ক্ষোভ ছিল। স্বগ্রামস্থ বালকগণের শিক্ষার অভাব তিনি মনে প্রাণে অনুভব করিতেন। এই অভাব কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য তাঁহারই যত্নচেষ্টায় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি কুমারখালীতে একটি বাংলা পাঠশালা সংস্থাপিত হয়। তিনি বিনা-বেতনে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ ও অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা-কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। যে-সকল বিষয়ে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান ছিল না, তাহা গৃহে বাল্যসখা মথুরানাথ মৈত্রেয়ের (অক্ষয়কুমারের পিতার) সাহায্যে অধিগত করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

ক্রমে বিদ্যালয়টি গবর্মেণ্টের অর্থসাহায্যলাভে সমর্থ হইল। স্কুল-কমিটি হরিনাথের বেতন ২০৲ টাকা স্থির করিলেন। কিন্তু হরিনাথ এই টাকা পূরা গ্রহণ করিলেন না। তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :—

> আমি বিশ টাকা গ্রহণ করিলে, নিম্নশ্রেণীস্থ শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। আমি পনের টাকা গ্রহণ করিয়া নিম্নশ্রেণীস্থ শিক্ষকদিগের যথাযোগ্য বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া সুখী হইলাম। এই পনের টাকা পর্য্যন্তই আমার জীবনের বৈতনিক উপার্জ্জন।

বালিকাদের শিক্ষার জন্য হরিনাথ কুমারখালীতে একটি বালিকা-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কুমারখালীতে বঙ্গবিদ্যালয় ও বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে হরিনাথ 'সংবাদ প্রভাকরে' (১৫ এপ্রিল ১৮৫৭) একখানি পত্র প্রকাশ করেন; পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> এই কুমারখালী গ্রামে ইতিপূর্ব্বে সুপ্রণালীসিদ্ধ বিদ্যা-মন্দির না থাকায় তন্নিবাসী বালকবৃন্দ আলস্য সলিলে অঙ্গ ঢালিয়া অন্যান্য জনগণের গলগ্রহ হইয়া উঠিয়াছিল। এই নিষ্কলঙ্কিত গ্রাম তাহাদের অত্যাচারে নানা কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছিল, বিদ্যালোচনা ব্যতীত এই অনিষ্ট নিবারণ কল্পে কি কোন সদুপায় নাই, বিবেচনায়···শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ কুণ্ডু মহাশয় ইং ১৮৫৪ সালের ১৭ জানুয়ারীতে অত্র গ্রামে এক ইংরাজী ও বাঙ্গলা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং তদনুজ

হরিনাথ মজুমদার

শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় ইং ১৮৫৫ সালের ১৩ জানুয়ারীতে তথায় আর একটি বাঙ্গলা পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া আপামর সাধারণের মহদুপকার করিয়াছেন, এই সদনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে তাঁহারদিগকে যে কতই কটু কাটব্য সহ্য করিতে ও কতই বা কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহার পরিসীমা নাই। কুসংস্কারশীল কতিপয় মহাশয়েরা কতবার তাহার সমূলোচ্ছেদ করিবার যত্ন পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে উচ্ছেদ না হইয়া বরং অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অমোঘ যত্ন ও উৎসাহ-উৎস উৎসারিত হইয়া বিদ্যা-তরু দিন দিন ফলবান্ হইতেছে, আহা, কি আশ্চয্য পরিবর্ত্তন! যে গ্রামে নূতন প্রথানুসারে একটি বাঙ্গলা পাঠশালা স্থাপন করিতে কত ব্যক্তি বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রামে ই° ১৮৫৬ সালের ২৩ ডিসেম্বরে অশেষ-গুণালঙ্কৃত শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয়ের যত্নবলে একটি বালিকা পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, তিনি প্রথমতঃ আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, তদনন্তর গ্রামস্থ ভদ্রাভদ্র সকলের বালিকা এই বিদ্যামন্দিরে পাঠার্থ প্রবিষ্ট হইতেছে। এ বিষয়ে এক্ষণে আর কাহারো কোন আপত্তি নাই বরং উৎসাহেরই নিদর্শন প্রদর্শন হইতেছে, সুতরাং অত্যল্প দিনের মধ্যেই যে বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি হইবে তাহার আর সংশয় কি?

কুমারখালী।
বিদ্যোৎসাহিনী সভা।

শ্রীহরিনাথ মজুমদার।

যে বঙ্গবিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠার মূলে হরিনাথ ছিলেন, সেই প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে একখানি পত্র 'সংবাদ প্রভাকরে' (২৭ ডিসেম্বর ১৮৫৯) প্রকাশিত হয়, তাহাও উদ্ধৃত হইল :—

প্রায় পঞ্চ বৎসরাতীত হইল কতিপয় সজ্জনের বিশেষোৎসাহে এই কুমারখালীতে একটি বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। পরে অনুদিন ছাত্রবৃন্দের ও আয়ের ক্রমশঃ উন্নতি হওয়াতে পূর্ব্বভাগের ইনিস্পেক্টর শ্রীযুক্ত হেনেরি উড্রো সাহেব মহাশয় অত্রস্থানে আগমন করিয়া ছাত্রদিগের পরীক্ষা করেন, এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী উত্তমরূপ দেখিযা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যাধীন করিয়াছিলেন, পরে কয়েক বৎসর সুপ্রণালীতে বালকদিগের শিক্ষাকায্য সম্পন্ন হওয়াতে নয় জন বালক ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়। সার্দ্ধ বৎসর হইল এই বিদ্যালয়েব ভবনাভাবে ভগ্নাবস্থা হওয়াতে ছাত্রগণের ও আয়ের দিন দিন ন্যূন হইতেছে, তথাচ এ বর্ষ পাঁচ জন ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য বিদ্যালয়ে প্রবেশানুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তদ্দর্শনে এতন্নগরস্থ সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণে যে কীদৃশ আহ্লাদের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা অসাধ্য। এমন কি যে মহাশয়দিগের এই বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ দ্বেষ ছিল, তাঁহারাও সন্তুষ্ট হইয়া এখন আগ্রহপূর্ব্বক আপনাপন পুত্র দিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। যাহা হউক এক্ষণে এই বক্তব্য এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মজুমদার মহাশয়ের সাতিশয় যত্নে ও অপরিসীম শ্রমগুণে এবং শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ কুণ্ডু সম্পাদক মহাশয়ের অপার সৌজন্যে এই বিদ্যালয়ের

এত দূর উন্নতি সাধন হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই,…।
শ্রীদ্বারকানাথ প্রামাণিক। সাং কুমারখালি

সাহিত্য-সাধনা

'সংবাদ প্রভাকরে' প্রাথমিক রচনা

অল্প বয়স হইতেই গদ্য-পদ্য রচনায় হরিনাথের অভ্যাস ছিল। তিনি মাঝে মাঝে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে রচনাদি পাঠাইতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেগুলি প্রয়োজন-মত সংশোধন করিয়া 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ করিতেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে তাঁহার একটি রচনা উদ্ধৃত করিতেছি :—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

প্রাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রণতি পরার্দ্ধ নিবেদন মিদং।

নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি পদ্য রচনা সংশোধন করত ভবদীয় পৃথ্বী প্রপূজ্য প্রভাকর পত্রিকা প্রান্তে প্রকটন করিয়া অজ্ঞান প্রপন্নকে জ্ঞান প্রদানে বাধিত করিবেন ইতি।

টাকা।

পদ্য।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ টাকা, ধিক্ ধিক্ ধিক্।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে, কি কব অধিক॥

রজত কাঞ্চন ছিল, জগত রঞ্জিত।
অঙ্কিত হইয়া তারা, হোলো কলঙ্কিত॥
তোমাকে করিল স্বষ্টি, করিতে সুসার।
অসার হইয়া হোলে, বিবাদের সার॥
তোমার কারণে লোক, লাঠালাঠি করে।
কত শত জমীদারে, গেল ছারখারে॥
তোমার কারণে ঘটে, অঘট ঘটনা।
পুত্র হোয়ে জনকেরে, করে প্রবঞ্চনা॥
সহোদর তুল্য প্রিয়, ত্রিভুবনে নাই।
তোমা হেতু কাটাকাটি, করে দুই ভাই॥
তোমাতে মাতিয়া দেখ, যত মর্ত্ত্যলোক।
একেবারে হারায়ে, বসেছে পরলোক॥
টাকা ধ্যান টাকা জ্ঞান, টাকা বুকে ধোরে।
কত লোক মোরে গেল, টাকা টাকা কোরে॥
আঁধার ঘরেতে ধন, চাবি দিয়া রেখে।
শুকায়ে মরিছে লোক, ফেণ মাত্র চেখে॥
ইহার অধিক আর, কি আছে অধিক।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ টাকা, ধিক্ ধিক্ ধিক্।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে, ধিক ধিক্ ধিক্॥

—*—

তোমা হেতু কত জন, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে।
অপরের প্রাণ নাশে, ধর্ম্ম কর্ম্ম খেয়ে॥
নিয়ম অতীত কেহ, পরিশ্রম করে।
অকালে কালের গ্রাসে, ভুক্ত হোয়ে মরে॥

আত্মীয় স্বজন তেজি, কত শত জন।
তোমা হেতু করিতেছে, সমুদ্র লঙ্ঘন ॥
কত সদ্বিদ্যাবান, জ্ঞান হারাইয়ে।
রাজদ্বারে দণ্ডনীয়, উৎকোচ খেয়ে ॥
কত বুধ মহাশয়, তোমার কারণ।
শাস্ত্রের যথার্থ ভাব, করিছে গোপন ॥
তোমার লোভেতে লোক, পাগলের প্রায়।
পর ধন হরি পরে, বেড়ী পরে পায় ॥
তুমি অর্থ একমাত্র, অনর্থের হেতু।
চোকের পদ্দা উল্‌টায়েছ, ভেঙ্গে লজ্জা সেতু ॥
তব গুণ বল্‌তে প্রাণ, জলে ধিক্ ধিক্ ধিক্।
ধিক ধিক ধিক তোরে, ধিক্ ধিক্ ধিক্ ॥

—*—

টাকা হে তোমার গুণে, কত কাণ্ড হয়।
ব্যাধি হোতে মুক্ত হোয়ে, কত মহাশয় ॥
তোমাকে ছাড়িতে মনে, কষ্ট বোধ করি।
বৈদ্যরাজ ফাঁকি দেয়, সুমন্ত্রণা ধরি ॥
সমূহে রয়েছে ব্যাধি, এই কথা বলে।
মিথ্যাবাদী হোয়ে থাকে, সুজন মণ্ডলে ॥
তোমার কারণে টাকা, বিজ্ঞ ফটিক চাঁদে।
ধনী হোয়ে ডাক্তারের, পায়ে পড়ে কাঁদে ॥
এ কথা বলিতে মনে, লজ্জা হয় ভারি।
গেঁটে টাকা পেটে ক্ষুধা, বিড়ম্বনা ভারি ॥
তোমার মায়ায় মুগ্ধ, হোয়ে কত জন।
সন্তানের ব্যাধি রাখে, করিয়ে গোপন ॥

টাকার কারণে আর, পুত্র প্রাণাধিক।
ধিক্ ধিক ধিক্ টাকা, ধিক্ ধিক্ ধিক্।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে, ধিক্ ধিক্ ধিক॥

—*—

পরের দৃষ্টান্ত আগে, দিয়েঁ এতক্ষণ।
নিবেদন করি কিছু, আত্ম বিবরণ॥
হই নাই যত দিন, তোমাব অধীন।
অচিন্তায় কত সুখে, কাটায়েছি দিন॥
হৃষ্ট পুষ্ট ছিল কায়, সবল অন্তর।
তিলার্দ্ধের হেতু সুখ, ছিল না অন্তব॥
তোমার অধীন হোয়ে, সে সব গিয়াছে।
বপুরাজ্যে দুর্ভাবনা, রাজা হইয়াছে॥
ইতিপূর্ব্বে প্রিয়বন্ধু, তুষিত সুভাষে,
তোমার কারণ কটু, কহিছে আভাষে॥
সন্দেহ করিছে কত, আত্ম পরিজন।
ইহা হোতে বরণ্ ভাল, এ দেহ পতন॥
অল্প দিন হইয়াছি, তোমার অধীন।
অসহ্য যাতনা দিয়া, দেহ কর ক্ষীণ॥
সকলি করেছ তুমি, বাকী কি রেখেছ।
বন্ধু বিচ্ছেদের সূত্র, সূচনা করেছ॥
ইহা হোতে কষ্ট বল, কি আছে অধিক।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ টাকা ধিক্ ধিক ধিক।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে, ধিক্ ধিক্ ধিক্॥

শ্রীহরিনাথ মজুমদার।
সাং কুমারখালি।

ঈশ্বর গুপ্তের উপদেশ ও সহায়তায় হরিনাথ সুলেখক হইয়া উঠিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'বিজয়-বসন্তে'র কথা কে না জানেন? আর কোন বাংলা গ্রন্থের ভাগ্যে এরূপ বহুল প্রচার ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।

জমিদার, মহাজন, কুঠিয়াল ও গোরা পল্টনের উৎপীড়নে প্রজাপুঞ্জের দুর্দশা দেখিয়া হরিনাথের হৃদয় ব্যথিত হইত। তিনি এই সকল অত্যাচারের কথা কখন কখন সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রকাশ করিতেন। অবশেষে তিনি পল্লীবাসীদের আর্ত্তনাদ রাজদ্বারে পৌঁছাইবার জন্য নিজেই একখানি পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প করিলেন।

'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল (১২৭০, বৈশাখ) মাসে হরিনাথ 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক সমাচার পত্র প্রকাশ করিলেন। ইহা কলিকাতায় গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত হইত। পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বাস্ত-চন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা॥

১২৮১ সালের এক সংখ্যা 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' দেখিয়াছি; তাহার মলাটের উপর এই কবিতাংশ মুদ্রিত দেখিতেছি :—

Some to the fascination of a name
Surrender judgement hoodwinked—
Cowper

১২৭৪ (?) সালের বৈশাখ মাসে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র একটি পাক্ষিক সংস্করণও প্রকাশিত হয় ; ১২৭৭ সালের বৈশাখ হইতে পাক্ষিক সংস্করণ সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। নানা কারণে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

হরিনাথের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' সম্বন্ধে যে-সকল কথা আছে, তাহা হুবহু উদ্ধৃত করায় বাধা আছে, এই কারণে স্থানে স্থানে বাদ দিয়া নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :—

> আমি শুনিলাম, বাঙ্গলা সংবাদপত্রের অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত একটি কার্য্যালয়ও স্থাপিত হইবে। 'ঘরে নাই এক কড়া, তবু নাচে গায় পড়া'। আমার ইচ্ছা হইল, এই সময় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়া, গ্রামবাসী প্রজারা যে যে ভাবে অত্যাচরিত হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগত করিলে, অবশ্যই তাহার প্রতিকার এবং তাহাদিগের নানা প্রকার উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রাম ও গ্রামবাসী প্রজার অবস্থা প্রকাশ করিবে বলিয়া পত্রিকার নাম 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' রাখিয়া 'গিরিশযন্ত্রে'র কর্ত্তা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে একটি শিরোমুকুট অর্থাৎ হেডিং আর একটি শ্লোক প্রস্তুত করিতে প্রতিশ্রুত করাইলাম। [১৮২৪ পৃ.]

কুমারখালী বাঙ্গলা পাঠশালার যে ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন,

সেই পুলিনচন্দ্র সিংহ, দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করায় (প্রধান শিক্ষক আমি) আমার শ্রম অনেক লাঘব হইল। উক্ত পাঠশালার যে যে ছাত্র তখন নিজ নিজ পৈতৃক বিষয়কার্য্য করিয়া উন্নতি প্রদর্শনে প্রশংসালাভ করিতেছেন, সেই কৈলাসচন্দ্র প্রামাণিক ও গোবিন্দচন্দ্র চাকীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অবধারিত করিলাম, তাঁহারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিবেন। উক্ত পুস্তকালয় হইতে সম্বাদ পত্রিকা গ্রামবার্ত্তাও প্রকাশিত হইবে। আমি পত্রিকার সম্পাদক হইয়া এবং নিজ স্কন্ধে তাহার দায়িত্ব রাখিয়া লিখিবার ভার বহন করিব। কিন্তু আর্থিক ক্ষতিবৃদ্ধির নিমিত্ত দায়ী হইব না, পুস্তকালয় যেমন লাভ গ্রহণ তদ্রূপ ক্ষতিও স্বীকার করিবে। যদি পুস্তকালয় পত্রিকার নিমিত্ত বিশেষ লাভবান্ হয়, তবে আমি তখন ভাতা-স্বরূপ কিছু কিছু পাইব।···(১৪২৫-২৬ পৃ.)

গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা সংবাদপত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও নানা প্রকারে গ্রামবাসীদিগের উপকার সাধিত হইবে এবং তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানা প্রকার আশা করিয়া পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষদিগের উক্ত নিয়মে অগত্যা বাধ্য হইয়া 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র কার্য্য আরম্ভ করিলাম। ১২৭০ বার শত সত্তর সাল, বৈশাখ মাসে কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রথমতঃ মাসে একবার চারি ফর্ম্মা করিয়া গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকার প্রচার আরম্ভ হইল। প্রথম বৎসর লাভ দেখিয়া দ্বিতীয় বৎসরও পুস্তকালয় গ্রামবার্ত্তার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকার করিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে ক্ষতি হইল দেখিয়া তাহার অধ্যক্ষরা তৃতীয় বৎসরে পুস্তকালয়ের কার্য্য

বন্ধ করিলেন সুতরাং গ্রামবার্ত্তা প্রচারের উপায়ও তৎসঙ্গে বন্ধ হইল। সংবাদপত্র লিখিয়া লাভবান্ হইব, আমি এই ইচ্ছায় তাহার কার্য্যভার গ্রহণ করি নাই। সুতরাং লাভ না দেখিয়া লাভাভিলাষী পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষগণের ন্যায় গ্রামবার্ত্তা প্রচারের ইচ্ছা আমার সঙ্কোচিত হইল না, বরং আরও বলবতী হইয়া আমি উক্ত অনিবারিণী ইচ্ছার অনুগামী হইয়া নিজেই তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসংকল্প হইলাম এবং লজ্জা ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ধারণ করিলাম। পুস্তকালয়ের সাহায্যে দুই বৎসর গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে 'গ্রামবার্ত্তা' এবং তৎব্যতীত 'চারুচরিত্র' নামক একখানি পুস্তক ছাপা করিয়া আমি তাঁহার নিকট পরিচিত ও বিশ্বস্ত হইয়াছি। সুতরাং তৃতীয় বৎসরের নিমিত্ত গ্রামবার্ত্তার কার্য্য আরম্ভ করিতে আশু টাকার প্রয়োজন হইল না।...[১৪২৭-২৮ পৃ.]

গ্রামবার্ত্তার প্রবন্ধাদি এবং আগত পত্রে সংবাদাদি বিচার ও সংশোধন করিয়া চারি ফরমার উপযুক্ত আদর্শলিপি অর্থাৎ কাপি হাতে লিখিয়া যথাসময়ে যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করা অল্প সময়ের প্রয়োজন নহে, ইহার পর মূল্যাদি আদায় ও অন্যান্য কারণে [১৪৩০ পৃ.] এবং পত্রপ্রেরক প্রভৃতি নানা লোকের নিকট পত্রাদিও সর্ব্বদা লিখিতে ও নিজের স্ত্রীপুত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ সাংসারিক কার্য্য প্রভৃতিতেও অনেক সময়ের আবশ্যক হইত।... অতএব আমি শ্যাম ও কুল উভয় রক্ষা করিতে না পারিয়া... পাঠশালার কার্য্যরূপে মাতৃভাষার সেবা হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম এবং গ্রামবার্ত্তা প্রচারে গ্রামবাসী ও মাতৃভাষার সেবা করিতে ব্রতপরায়ণ হইলাম। জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত পাঠ্য

পুস্তকাদি বিক্রয়ের পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলাম। [১৪৩২ পৃ.]

আমি এইরূপে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশের দ্বারা গ্রামবাসী ও গ্রামবার্ত্তার সেবা করিতেছি। গ্রামবার্ত্তার তৃতীয় বৎসর অনায়াসে অতিবাহিত হইল। চতুর্থ বৎসরে পত্রদ্বারা অবস্থা অবগত করিয়া গ্রাহকগণের নিকট, প্রাপ্য মূল্য আদায় ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিল। এক দিন দুই দিনের দূরবর্ত্তী স্থানে নিজেই গমন করিয়া মূল্য আদায় করিতে লাগিলাম। তৎসঙ্গে দুই এক জন গ্রামবৎসল ব্যক্তি নূতন গ্রাহকও হইতে লাগিলেন। আমিই লেখক, আমিই সম্পাদক, আমিই পত্রিকা লেফাফা ও বিলিকারক এবং আমিই মূল্য আদায়কারী অর্থসংগ্রাহক। আবার আমিই আমার স্ত্রীপুত্রাদি সংসারের সংসারী। দীনজনের দীনতার দিন এই ভাবে দিন দিন গত হইতেছে। [১১৩৯ পৃ.]

·· এত দিনে ক্রমান্বয়ে অনেকে বুঝিতে পারিলেন, পূর্ব্বে অনেক ধনবানাদি সবল লোকেরা দুর্ব্বলের প্রতি প্রকাশ্যরূপে সহসা যে প্রকার অত্যাচার করিতেন, এক্ষণে যে তদ্রূপ করিতে সাহসী হইতেছেন না,···গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকাই তাহার কারণ। অতএব ন্যায়বান্ কতিপয় গ্রামবাসী গ্রামবার্ত্তার উন্নতির নিমিত্ত একটি ভবন-সভা করিয়া মাসিক গ্রামবার্ত্তাকে পাক্ষিকরূপে প্রকাশ করিতে বলিলেন এবং আপনারা সাধ্যানুসারে দুই শত হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত একদা দান অঙ্গীকারপূর্ব্বক দানপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। আমি তাঁহাদিগের আদেশ অনুসারে······ [১২৭৪ ?] সালের বৈশাখ মাস হইতে গ্রামবার্ত্তা পক্ষান্তরে প্রচার করিয়া তাহার কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলাম।

[১৪৪২ পৃ.] প্রায় দুই মাস গত হইল কেহই টাকা আদায় করিলেন না। আমি ঘোর বিপদে পতিত হইয়া "কিরূপে গ্রামবার্ত্তার জীবনরক্ষা হইবে" অনন্যমনস্ক হইয়া দিবারাত্রি যে প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত চিন্তা করিলে তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারিতাম সন্দেহ নাই। কুমারখালীনিবাসী রাধাগোবিন্দ মজুমদারের নিকট হইতে ১০০৲ এক শত টাকা হাওলাত লইয়া উপস্থিত বিপদের আশু প্রতিকার করিলাম। কতক দিন পরে যিনি ২০০৲ দুই শত টাকা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তিনি এক শত আদায় করিলে আশু ঋণ পরিশোধিত হইল। কিন্তু এই এক শত টাকা ব্যতীত, যিনি ২০০৲ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, [১৪৪৩ পৃ.] তিনি যেমন অবশিষ্ট টাকা দিলেন না, তদ্রূপ অন্য স্বাক্ষরকারিগণ বিন্দুবিসর্গও আদায় করিলেন না। সুতরাং কিরূপে গ্রামবার্ত্তার জীবন থাকিবে এই এক বৎসর সেই চিন্তায় অনেক রাত্রি অনিদ্রায় গত হইতে লাগিল। উক্ত প্রকার চিন্তার পর, কোথা হইতে কোন্ বিষয়ে কি প্রকারে প্রয়োজন সাধন হইয়া গ্রামবার্ত্তার জীবন রক্ষা করিয়াছে, সে সমুদায় ধারাবাহিকরূপে এক্ষণে আমার স্মরণ নাই। তবে এ স্থলে কেবল এইমাত্র বলিতেছি, গ্রামবাসীদিগের —হিতৈষী অনেক ধনাঢ্য লোকের বার্ষিক ও একদা দানে পাক্ষিকের পর গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে সাপ্তাহিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। যখন গ্রামবার্ত্তা মাসিক ছিল, তখন ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি সাহিত্যময় প্রবন্ধ এবং রাজনীতিময় প্রস্তাব, গ্রামের ঘটনাময় সম্বাদ সহকারে গ্রামবাসীদিগের জ্ঞাতব্য রাজার অভিপ্রায়, মন্তব্য ও বিবিধ

সংবাদ প্রকাশিত হইত. পাক্ষিকাবস্থায় ধর্ম্মনীতি সাহিত্য ব্যতীত পূর্ব্ববৎ আর সকলেরই [১৪৪৪ পৃ.] প্রচার হইয়াছে। সাপ্তাহিকাবস্থায় সাহিত্যময় প্রবন্ধাদি প্রচার রহিত হইয়া বাহুল্য-রূপে রাজনীতিরই আলোচনা হইতে লাগিল। কিন্তু সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি আলোচনার নিমিত্ত স্বতন্ত্ররূপে একখানি মাসিক গ্রামবার্ত্তাও প্রকাশিত হইত। [১৪৪৫ পৃ.]· …

কেবল সংবাদদাতা, পত্রপ্রেরক ও শ্রুতিকথার প্রতি নির্ভর করিয়া গ্রামবার্ত্তার প্রকাশ হইত না। আমরা গ্রামবার্ত্তার উপযুক্ত বার্ত্তা জানিবার নিমিত্ত কখনও গোপনে কখনও প্রকাশ্যে নানা স্থান পরিদর্শন ও দূরস্থ গ্রামপল্লী অবসর মত সময়ে সময়ে ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই প্রকার ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুর, উলাদি উপনগর পরিদর্শনে তাহার নামোৎপত্তির কারণ ও প্রাচীন বৃত্তান্ত এবং মেহেরপুর, চাকদহ ও উলা প্রভৃতি স্থানের মহামারীর অবস্থা অনেক সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উক্ত উপায়ে নিজে যাহা সংগ্রহ করি ও হিমালয় প্রভৃতি নানা দিক্ দর্শন করিয়া ভ্রমণকারিগণ যাহা সংগ্রহ করিতেন, তাহা সমস্তই মাসিক গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইত। নানা প্রদেশের ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইয়া গ্রাম ও পল্লীবাসীদিগের যত দূর উপকার সাধন করিয়াছিল, আমি তত দূর অত্যাচারী লোকের বিষনেত্রে পড়িয়া নানা প্রকারে উৎপীড়িত ও অত্যাচরিত হইতে লাগিলাম। [১৭৬২-৩ পৃ.] … …

চারি দিকে পুস্তক বিক্রয়ের দোকান যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আমার জীবিকার স্বরূপ পুস্তকালয়ের আয় ক্রমে অল্প হইয়া আসিল। যদি গ্রামবার্ত্তার প্রতি উক্ত ভার অর্পণ করি,

তবে সে চলিতে পারে না, নিজের ভার নিজে বহন করিবারও আর কোন প্রকার উপায় নাই।...এই সময়ে রংপুর তুষভাণ্ডারের রাজা রমণীমোহন রায় চৌধুরীর দান [মাসিক ১০৲] রহিত হওয়ায় মাসিক গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইযাছিল। [১৪৯১ পৃ.]...

রাজীবলোচন মজুমদার আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ সারগ্রাহী পরম বৈষ্ণব কুঞ্জবিহারী মজুমদারের প্রপৌত্র। রাজীবলোচন মজুমদার আমার ছাত্র কৃষ্ণচন্দ্র মৈত্রের মুখে শুনিয়াছিলেন, একটি প্রেস অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্র হইলে কুমারখালী সংবাদপত্রিকা 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' ইহা অপেক্ষা ভালভাবে চলিতে পারে এবং উক্ত প্রেস ধরিয়া আমাদিগের ন্যায় অন্যূন সাত আটটি পরিবার অনায়াসে অন্ন সংগ্রহ করিতে পাবে। তিনি বৃন্দাবন-গমনের সময় কলিকাতায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। [১৬৭৩ পৃ.] সেই সময় গ্রামবার্ত্তার প্রেস ক্রয় করিতে আমার নিমিত্ত ৬০০৲ ছয় শত টাকা...আমার খুড়া নবীনচন্দ্র সাহার নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলেন।...উক্ত টাকায় প্রেস কবিবার নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে পত্র লিখিয়া তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিলেন, "উক্ত টাকা প্রেস করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে দান করিয়াছি। তুমি প্রেস স্থাপন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের কথানুসারে যত জন নিরন্ন দুঃখী পরিবার প্রতিপালনে এবং ভালরূপে গ্রামবার্ত্তার কার্য্য চালাইতে পারিবে, আমি তোমার প্রতি ততই সন্তুষ্ট হইব।" আমি উক্ত পত্রানুরারে টাকার অধিকারী হইলে [১৬৭৪ পৃ.] 'মথুরানাথ-যন্ত্র'* নামে এই বর্ত্তমান প্রেসটি,

* ইহা ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৮০ সালের ১৭ই শ্রাবণ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের উল্লেখ আছে।—ব্র. না. ব.

তৎকালে কলিকাতাস্থ বন্ধুগণ ক্রয় করিয়া পাঠান। [১৬৭৫ পৃ.]...

আমি প্রেস স্থাপন ও তাহা হইতে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশ এবং নিজ পরিবার ও প্রেসের কর্ম্মচারী অন্য ৬-৭টি পরিবারের অন্ন সংগ্রহ করিয়া খুড়া রাজীবলোচন মজুমদারের আদেশ পালন করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার অর্থকৃচ্ছ্রতা পূর্ব্বে যেমন ছিল, তাহা অপেক্ষা বরং ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্ব্বে কেবল গ্রামবার্ত্তার নিমিত্ত চিন্তা ছিল, এখন তদ্সঙ্গে প্রেস চালাইবার চিন্তা উপস্থিত হইল। [১৬৮১ পৃ.]... ..

আমি প্রেস স্থাপন ও কতিপয় বৎসর গ্রামবার্ত্তার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ক্রমেই ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিলাম,—দেখিয়া আমার ছাত্র কুমারখালীর বাঙ্গলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য কয়েক জন বন্ধুবান্ধব, আমার হস্ত হইতে 'গ্রামবার্ত্তা' গ্রহণ এবং তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কয়েক বৎসর কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, আমি পরে কাগজ পত্র আলোচনা করিয়া দেখিলাম, পূর্ব্ব ও পরে একত্রিত হইয়া সর্ব্বসুদ্ধ ১২০০৲ বার শত টাকা ঋণ হইয়াছে। এদিকে আমার শরীর ক্রমেই বার্দ্ধক্য জরার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। অতএব, আর ঋণবৃদ্ধি হওয়া উচিত হয় না মনে করিয়া গ্রামবার্ত্তার কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলাম। * [১৬৮৪ পৃ.] †

* মাসিক 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' ১২৮৮ সালের চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' প্রথম বন্ধ হয় ১২৮৬ সালে। ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাসে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন প্রভৃতির পরিচালনে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়া ১২৯১ সালের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।—ব্র. না. ব.

† কাঙ্গাল হরিনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মজুমদার কাঙ্গালের ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত অংশ আমাকে ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

পত্রিকা-সম্পাদনে হরিনাথের নির্ভীকতা ও সত্যবাদিতা আদর্শ ছিল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিয়াছেন :—

হরিনাথের গ্রামবার্ত্তা সত্য সত্যই দেশের মধ্যে "দোষ-প্রদোষধ্বান্তচন্দ্রিকা" হইয়া উঠিল। ইহাতে দেশের অনাথ প্রজাপুঞ্জের উপকার হইতে লাগিল, কিন্তু অনেকে হরিনাথের শত্রু হইয়া উঠিলেন। হরিনাথ যেরূপ নির্ভীকভাবে "দোষপ্রদোষ" বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে জেলার মাজিষ্ট্রেট এবং পরগণার জমিদার, উভয়েই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। হরিনাথকে হস্তগত করিবার জন্য অর্থলোভন ও তর্জ্জন গর্জ্জন প্রদর্শনের কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। অবশেষে হরিনাথ গ্রামবার্ত্তায় লিখিলেন,—

"মাতৃ ও পিতৃভক্ত কোন ব্যক্তিকে কেহ যদি বলে, তুমি তোমার পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ কর, যদি না কর তবে দণ্ডিত হইবে। এই দণ্ডভয়ে কি কেহ পিতা মাতার সেবা পরিত্যাগ করিতে পারেন? সত্যপালনই জগৎপিতার সেবা করিবার উপায়, এই সত্য পালন করিয়া জগৎপিতার সেবা করিতে যদি কেহ দণ্ড করেন, তাহা হইলে কি আমরা তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করিব? অতএব যাঁহারা নূতন আইনের কথা শুনিয়া গ্রাম ও পল্লীবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি, ভ্রাতৃভাবে বিনয় করিয়া বলিতেছি, অত্যাচার পরিত্যাগ করুন। তাঁহার নিরীহ ও দুর্ব্বল সন্তানগুলি অত্যাচরিত না হয়, ঈশ্বর এই নিমিত্ত

ভারত রাজ্য ব্রিটিশ সিংহের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। অত্যাচার করিয়া এক দিন, না হয় দু দিন পার পাইবে, তিন দিনের দিন অবশ্যই তাহা রাজার কর্ণগোচর হইবে। আমরা এত দিন সহ্য করিয়াছি, আর করিতে পারি না। সকল কথা প্রকাশ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে ক্রটি করিব না। ইহাতে মারিতে হয় মার, কাটিতে হয় কাট, যাহা করিতে হয় কর, প্রস্তুত আছি। ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মালোচনা আর বাহিরে আসিয়া মনুষ্যশরীরে নিরপরাধে পাদুকা-প্রহার, এ কথা আর গোপন করিতে পারি না। ব্রিটিশরাজ্যের প্রতি এই অত্যাচার দেখিয়া যে প্রকাশ না করে, আমাদিগের মতে সেই রাজদ্রোহী।"

হরিনাথ স্বদেশ সেবার জন্য জীবন দান করিতে প্রস্তুত হইলেও জমিদার লজ্জিত হইলেন না; তাঁহাকে নির্য্যাতন করিবার জন্য পঞ্জাবী "গুণ্ডা" পর্য্যন্ত নিযুক্ত হইল। অবশেষে কাঙ্গাল হরিনাথেরই জয় হইল। কুমারখালীতে ছাপাখানা সংস্থাপন করিয়া এক পয়সা মূল্যে হরিনাথ গ্রামবার্ত্তা বিক্রয় করিতে লাগিলেন; কাঙ্গাল হইয়াও প্রজাসমাজে হরিনাথই রাজা হইয়া উঠিলেন। ..

যত দিন "গ্রামবার্ত্তা" জীবিত ছিল, প্রায় তত দিনই কোন-না-কোনরূপে হরিনাথকে জমিদারের উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত। ১২৮৫ সালের ২১ চৈত্র তারিখের একখানি স্বহস্তলিখিত পত্রে হরিনাথ তাঁহার কোনও স্নেহভাজন সাহিত্যসেবক প্রিয় শিষ্যকে লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

"জমিদারেরা প্রজা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি

যত দূর সাধ্য অত্যাচার করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, পরিশেষে অত্যাচারের হাত খর্ব্ব করিয়া আনিয়াছেন। এখন আর তাঁহাদিগের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। গ্রামবার্ত্তা যথাসাধ্য প্রজার উপকার করিয়াছে। পরে কি ঘটে, বলিতে পারি না।

জমিদারেরা যখন আমার প্রতি অত্যাচার করে, এবং আমার নামে মিথ্যা মোকদ্দামা উপস্থিত করিতে যত্ন করে, আমি তখন গ্রামবাসী সকলকেই ডাকিয়া আনি এবং আত্মাবস্থা জানাই। গ্রামের একটি কুকুর কোন প্রকারে অত্যাচরিত হইলেও গ্রামের লোকে তাহার জন্য কিছু করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ও আমার এত দূরই দুর্ভাগ্য যে, আমার জন্য কেহ কিছু করিবেন, এরূপ একটি কথাও বলিলেন না। যাঁহাদের নিমিত্ত কাঁদিলাম, বিবাদ মাথায় করিয়া বহন করিলাম, তাঁহাদিগের এই ব্যবহার!”

যে জমিদারের অত্যাচারে হরিনাথ এরূপ সকরুণ আর্ত্তনাদ করিয়া গিয়াছেন, কোনও স্থানে তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। আকারে ইঙ্গিতে যাহা জানাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে যাঁহাদিগের কৌতূহল দূর হইবে না, আমরা তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অসমর্থ। হরিনাথ যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সুতীব্র সমালোচনায় রাজদ্বারে পল্লীচিত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি এ দেশের সাহিত্যসংসারে এবং ধর্ম্মজগতে চিরপরিচিত;—তাঁহার নামোল্লেখ করিতে হৃদয় ব্যথিত হয়, লেখনী অবসন্ন হইয়া পড়ে!—‘সাহিত্য’, বৈশাখ ১৩০৩।

রচনাবলী

হরিনাথ আমরণ লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক, গীতাভিনয় ও পাঁচালি আছে। এগুলি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। হরিনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের অভাবে অনেক সময় গ্রামের যুবকগণ বিপথে বিচরণ করিয়া থাকে; তাহাদের উদ্ধারের জন্যই তিনি এই সকল নাটক গীতাভিনয় ও পাঁচালি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই শিক্ষা দিয়া যুবকদের দ্বারা এগুলি অভিনয় করাইতেন, কখন বা পাঁচালির দল করিয়া গান করিতেন। ইহা দ্বারা হরিনাথ গ্রামের মধ্যে ধর্ম্মভাব ও সুনীতি বিস্তারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতের—বিশেষতঃ বাউল-সঙ্গীতের সংখ্যাও বড় কম নহে। 'ভারতীয়-সঙ্গীত-মুক্তাবলী'তে বাংলা গীতিকবিতার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত স্থান লাভ করিয়াছে।

হরিনাথ যে-সকল পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। এই পুস্তক-পুস্তিকার সকলগুলি বর্ত্তমানে সংগ্রহ করা দুরূহ। বিজ্ঞাপনে কয়েকখানির নাম পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকাশকাল জানা যায় নাই।[১] হরিনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, কুমারখালী-নিবাসী শ্রীভোলানাথ মজুমদার কয়েকখানি পুস্তকের প্রকাশকাল

আমাকে জানাইয়াছেন, তিনিও সকল পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

১। **বিজয়-বসন্ত**। (নীতিগর্ভ উপাখ্যান) ১৭৮১ শক (ইং ১৮৫৯)। পৃ. ১০৫।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। ইহার বহু সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ৯ম সংস্করণ হইতে রচনার নিদর্শন-স্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> স্বামী স্ত্রীর পরমারাধ্য ও পরম গুরু। এই ভূমণ্ডলে স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর আর অন্য গুরু নাই। স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্টা হইলে, সকল ধর্ম্ম হইতে পতিতা হয়েন। স্ত্রী ছায়াতুল্য স্বামীর অনুগতা, ও সখীতুল্য তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে যত্নবতী হইবেন। সদা প্রিয়বাদিনী ও সদাচারা, এবং সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহে যত্নযুক্তা হইবেন। কখন প্রলাপবিলাপিনী বা ধর্ম্মকর্ম্মে বিরোধিনী হইবেন না। ভ্রমেও অন্য পুরুষকে মনে স্থান দিবেন না। পতি ভিন্ন অন্যের উপদেশে অবহেলা করিবেন। কেন না, এ দেশীয় ছদ্মবেশী অনেক ধার্ম্মিক উপদেশের ছলনায় অনেক অবলার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। সতী স্ত্রী, যে স্থলে পতিনিন্দা অথবা অসৎ বিষয়ের আলোচনা হইবে তথায়, কি সখীর আলয়, কি গুরুজনগৃহ, এমত স্থানে তিলার্দ্ধ কালও থাকিবেন না। আপনার অন্তঃকরণে যে সকল ভাবের উদয় হইবে, পতির নিকটে তৎসমুদায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করিবেন, কদাচ গোপন রাখিবেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে পতি যদি জড়, রোগী, অধন অথবা মূর্খ হয়েন, তথাপি পরিত্যাগ

করিবেন না। পতি ব্যভিচারাক্রান্ত হইলেও উগ্রবাদিনী না হইয়া সহজ কৌশলে নিবারণ করিতে যত্নবতী হইবেন; নতুবা পুরুষ যেমন ব্যভিচারিণী পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, স্ত্রীও ব্যভিচারাক্রান্ত পুরুষকে ত্যাগ করিলে শাস্ত্র বা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অপরাধিনী হন না। সর্ব্বদা পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান, পতি প্রাণ, পতি পরম গুরু, পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম, পতিসন্তোষই পরম সন্তোষ। সাধ্বী স্ত্রী দেবতাদিগের আদরণীয়া। ইনি ইহলোকে পরম সুখ সম্ভোগ করেন এবং পরকালে স্বর্গবাসিনী হয়েন। ইহা ভিন্ন সকল স্ত্রীই পরকালে নরকগামিনী হয় সন্দেহ নাই। (পৃ. ১৪০-৪১)

২। **পদ্মপুণ্ডরীক**। (পদ্য) ১২৬৯ সাল (ইং ১৮৬২)। পৃ. ৪২।

বালকপাঠ্য। ২৯ পৌষ ১২৬৯ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' সমালোচিত। ইহার কয়েক পংক্তি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

নাশের হেতু

রাজ্য-নাশ হেতু, রাজ অবিচার।
কার্য্য-নাশ হেতু, আলস্য সবার॥
বুদ্ধি-নাশ হেতু, মাদক-সেবন।
ঋদ্ধি-নাশ হেতু, জ্ঞাতি-বিরোধন॥
স্বাস্থ্য-নাশ হেতু, রাত্রি-জাগরণ।
কান্তি-নাশ হেতু, অমূল-চিন্তন॥
মান-নাশ হেতু, মিথ্যা-আচরণ।
প্রাণ-নাশ হেতু, রিপু-পরায়ণ॥

স্থখ-নাশ হেতু, পর-স্থখে দাহ।
সর্ব্বনাশ-হেতু, বালক-বিবাহ ॥

৩। **চারুচরিত্র।** ২৬ বৈশাখ ১২৭০ (ইং ১৮৬৩)। পৃ. ২০০।

বালক-পাঠ্য। ইহাতে দ্বাদশ শিশুর চরিত্র নানাবিধ ছন্দে রচিত হইয়াছে। প্রথম শিশু—অসাধারণ অধ্যবসায় ও গুরুভক্তিপরায়ণ নিষাদপুত্র বটু। দ্বিতীয় শিশু—রণনিপুণ অভিমন্যু। তৃতীয় শিশু—মাতৃভক্তিপরায়ণ ধ্রুব। চতুর্থ শিশু—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কচ। পঞ্চম শিশু—সূর্য্য-কুল-তিলক ভগীরথ। ষষ্ঠ শিশু—ক্ষমাশীল সিন্ধু। সপ্তম শিশু—ন্যায়পরায়ণ প্রহ্লাদ। অষ্টম শিশু—পিতৃভক্তিপরায়ণ পুরু। নবম শিশু—পিতৃভক্তিপরায়ণ বৃষকেতু। দশম শিশু—কৃষ্ণ ও বলরাম। একাদশ শিশু—তত্ত্বজ্ঞানী নিমাই। দ্বাদশ শিশু—পরাক্রমবিশিষ্ট লব ও কুশ।

এই পুস্তকখানি প্রথমে **'দ্বাদশ শিশুর বিবরণ'** নামে প্রকাশিত হয়। ইহার এক খণ্ড উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে আছে; পুস্তকের ভূমিকার তারিখ—"কুমারখালি ১২৬৯ সাল মাঘ।" পুস্তকখানিতে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি দোষ থাকায় উহা পরবর্ত্তী বৈশাখ মাসে 'চারুচরিত্র' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়। 'চারুচরিত্রে'র "বিজ্ঞাপন" অংশে প্রকাশ :—

> আমি উৎকট রোগাক্রান্ত হওয়ায়, এই পুস্তকের সংশোধন ভার জ্ঞানরত্নাকর-পত্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র বসাক মহাশয়ের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এবং আমার দুঃসময়প্রযুক্ত সংশোধন করা দূরে থাকুক, বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি নূতন কতকগুলি দোষ

সংযোজিত হয়, সুতরাং উক্ত মুদ্রিত পুস্তক আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার মুদ্রিত করাইতে হইয়াছে।...

এই পুস্তক প্রথমে "দ্বাদশ শিশুর বিবরণ" নামে প্রকাশিত হয়। অনন্তর উক্ত দোষাশ্রিত হওয়ায়, তৎপরিবর্ত্তে চারুচরিত্র নামকরণ করিয়াছি।...সন ১২৭০ সাল তাং ২৬ বৈশাখ।

'চারুচরিত্র' পুস্তকের এক খণ্ড কলিকাতা ইউনাইটেড রিডিং রুম্‌সে আছে।

৪। **কবিতাকৌমুদী**। মাঘ ১২৭২ (ইং ১৮৬৬)। পৃ. ৪৪।

বালকপাঠ্য। কলিকাতা ইউনাইটেড রিডিং রুম্‌সে ইহার এক খণ্ড আছে।

৫। **বিজয়া**। (পাঁচালি) ইং ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯। পৃ. ৩০।

ইহা "গোবিন্দচন্দ্র চাকী-সম্পাদিত"।

৬। **কবিকল্প**। (দক্ষযজ্ঞ বিষয়ক কাহিনী) ইং ১৮৭০। পৃ. ৫৮।

৭। **অক্রূরসংবাদ**। (গীতাভিনয়) বৈশাখ ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)। পৃ. ৪৭।

ইহা "'কবিকল্প' পুস্তকাবলম্বনে নাটকাকারে যাত্রা বা গীতাভিনয়"। ইহার প্রকাশক—কুমারখালীর বাজারস্থ গীতাভিনয় সভার অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার পাল—"বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন :—

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদার মহাশয়, আমাদিগের অনুরোধে যে কয়েক খানি "গীতাভিনয়" প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহা

ক্রমান্বয়ে মুদ্রাঙ্কণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এবারে "অক্রুর সম্বাদ" গীতাভিনয় পুস্তক মুদ্রিত হইল।

[পু]স্তকের "নান্দী" অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

রাগিণী সুরট, তাল ঝাঁপতাল।

মন ভজ রে নিত্য নিত্য, সত্য সনাতন নিত্য,
সত্য বিনে শান্তি নাই আর জেন এই সত্য সত্য।
সত্যসেবায় আত্মশুদ্ধি, দূরে পলায় ভ্রমবুদ্ধি,
সত্যতত্ত্বে জ্ঞানবৃদ্ধি সুপ্রকাশ্য আত্মতত্ত্ব।
(ওরে) লইলে সত্যের শরণ, অহংকার না থাকে কখন,
দ্বেষ হিংসা কাম ক্রোধ দূরে করে পলায়ন।
সত্যকে রাখিলে হৃদে, ডোবে না জীব পাপহ্রদে,
সত্য কলুষ সংহারে, প্রকাশে বিভুমাহাত্ম্য।
(ওরে) সত্য ভিন্ন ধর্ম্মকর্ম্ম, ধর্ম্ম নয় সে ধর্ম্ম মর্ম্ম
ভেদ করা কলুষ অস্ত্রে মনে জেন নিশ্চয়।
শুন ওরে ভ্রান্ত মন, সত্য পথে কর ভ্রমণ,
ষড় রিপু হবে দমন, পাবে পরম পদার্থ।

* * *

সূত্রধার।···গ্রামমণ্ডলীতে আজকাল শ্রীমদ্ভাগবতের বড় সমাদর। বৈষ্ণব মাত্রেই তাহার প্রতি ভক্তিমান, অতএব মহারাজ কংসের ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান হতে, অক্রূরসংবাদ পর্য্যন্ত অভিনয় করা যাক, তাতে অনেকের সন্তোষ সাধন হতে পারে।

এই পুস্তকের এক খণ্ড কলিকাতা ইউনাইটেড রিডিং রুম্‌সে আছে।

৮। **সাবিত্রী নাটিকা।** (গীতাভিনয়) ১২৮১ সাল।
পৃ. ৯০।

৯। **চিত্তচপলা।** (উপন্যাস) বৈশাখ ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬)। পৃ. ১৪৮।

"জাতিবিরোধীয় অপূর্ব্ব উপন্যাস"। কলিকাতা ইউনাইটেড রিডিং রুমসে ইহার এক খণ্ড আছে।

১০। **একলব্যের অধ্যবসায়।**

বালক-পাঠ্য। ইহা ১২৮১ সালের পরে প্রকাশিত।

১১। **ভাবোচ্ছ্বাস।** (নাটক)

ইহা ১২৯১ সালের পরে প্রকাশিত।

১২। **কাঙ্গাল-ফকিরচাঁদ ফিকীরের গীতাবলী।** ১২৯৩-১৩০০ সাল।

এগুলির ১৬টি খণ্ড প্রথমে খণ্ডশঃ ১২ পৃষ্ঠা হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম ১২টি খণ্ড একত্র "প্রথম ভাগ"-রূপে ১২৯৪ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়. ইউনাইটেড রিডিং রুম্‌সে ইহা আছে। দ্বিতীয় ভাগের চারিটি খণ্ড (১৩-১৬) শেষ বা, চতুর্থ খণ্ডটি ১৩০০ সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়। এই 'গীতাবলী'তে অপরের রচিত কতকগুলি গানও স্থান পাইয়াছে।

কাঙ্গালের মৃত্যুর পর—২৯ জানুয়ারি ১৯০৪ তারিখে এই গীতাবলী 'কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদ ফকীরের বাউল সঙ্গীত' (পৃ. ২৩০) নামে প্রকাশিত হয়।

১৩। **ব্রহ্মাণ্ডবেদ।** ১২৯৪-১৩০২ সাল।

ইহার ছয়টি ভাগ প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক ভাগ দ্বাদশ সংখ্যায় সম্পূর্ণ।

১৪। **কৃষ্ণকালী-লীলা।** (পাঁচালি) ১২৯৯ সাল। পৃ. ৩৮।

১৫। **অধ্যাত্ম-আগমনী।** ১৩০২ সাল। পৃ. ২৪।
কলিকাতা ইউনাইটেড রিডিং রুমসে ইহার এক খণ্ড আছে।

১৬-১৭। **আগমনী। পরমার্থ গাথা।**

এই দুইখানি সঙ্গীত-পুস্তক কাঙ্গালের সাধক-জীবনে—১২৯২ সালের পর রচিত ও প্রকাশিত হয়।

১৮। **মাতৃমহিমা।** ১৩০৪ সাল। পৃ. ৬০।
ইহা ১৩০২ সালে রচিত ও কাঙ্গালের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

* * *

এগুলি ছাড়া, হরিনাথ 'তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষার অর্থসংগ্রহ'ও প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি।

হরিনাথ গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ। ১৩০৮ সাল। পৃ. ৩৩২।

ইহা বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে জলধর সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচী :—কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনী (সতীশচন্দ্র মজুমদার-লিখিত), পরমার্থ গাথা, বিজয় বসন্ত, দক্ষযজ্ঞ, বিজয়া, অক্রূর সংবাদ, ভাবোচ্ছ্বাস, ফিকিরচাঁদের বাউল সংগীত।

সাহিত্য-শিষ্যগণ

হরিনাথ নিজেই যে মাতৃভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নয়, তিনি অনেককে সাহিত্য-সেবা-ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-শিষ্যগণের অনেকেই সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,

দীনেন্দ্রকুমার রায়, জলধর সেন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও মীর মশাররফ হোসেনের নাম করা যাইতে পারে। ইঁহাদের কেহই হরিনাথের সহানুভূতি ও উৎসাহলাভে বঞ্চিত হন নাই।

ফিকিরচাঁদের বাউল-সঙ্গীত

কৃতী শিষ্য—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন, প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির হস্তে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'-সম্পাদনের ভার দিয়া হরিনাথ অতঃপর সাধন-ভজনে মন দিলেন। এই সময় তিনি কুমারখালীতে একটি বাউলের দল গঠন করেন; এই দলের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াই সাধারণের নিকট তিনি কাঙ্গাল হরিনাথ নামে পরিচিত। জলধর সেন 'কাঙ্গাল হরিনাথ' পুস্তকের ১ম খণ্ডে এই বাউলের দল প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

> একবার গ্রীষ্মের অবকাশের সময় শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ভায়া বাড়ীতে (কুমারখালি) আসিয়াছেন। তিনি তখন বি. এল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আমি তখন স্কুলমাষ্টার। আমারও গ্রীষ্মাবকাশ। আমরা তখন বাড়ীতে আসিয়া কাঙ্গালের বড় সাধের 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রিকার সম্পাদন করি, আর অবসর সময় আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়া দিই।
>
> এই সময়ে একদিন মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্মের জ্বালায় অস্থির হইয়া, গ্রামবার্ত্তার 'কাপি' লেখা পরিত্যাগ করিয়া, আমরা হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছি। স্থান গ্রামবার্ত্তার আফিস,

অর্থাৎ কাঙ্গাল হরিনাথের চণ্ডীমণ্ডপের একটি কক্ষ। উপস্থিত শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার, গ্রামবার্ত্তার প্রিণ্টার প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কুমারখালী বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং ছাপাখানার ভূতের দল। ভূতের দল ব্যাকরণ ও সাহিত্যে পণ্ডিত ছিল না, কিন্তু তাহারা সকলেই কাঙ্গালের শিষ্য, সকলেই গান করিতে পারিত। চুপ করিয়া শয়ন করিয়া থাকা আমাদের কাহারও কোষ্ঠীতে লেখে না। দ্বিপ্রহরে রৌদ্রের মধ্যে কি করা যায়, ইহা লইয়াই একটা তর্ক আরম্ভ হইল। তর্ক বেশ চলিতে লাগিল, কিন্তু কর্ত্তব্য স্থির হইল না; তর্কের যাহা গতি হইয়া থাকে তাহাই হইল। অক্ষয় বলিলেন যে, "একটা বাউলের দল করিলে হয় না?" এ কথাটা মনে হইবারও একটা কারণ ঘটিয়াছিল। সেদিন প্রাতঃকালে লালন ফকির···কাঙ্গালের কুটীরে, আমরা যেদিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন আসিয়াছিলেন এবং কয়েকটা গান করিয়াছিলেন।··· সকলেই তখন বলিয়া উঠিলেন "বেশ, বেশ।"

"বেশ, বেশ" বলাটা খুব সহজ; কিন্তু গান কোথায়? বাউলের গান তখন তেমন প্রচলিত হয় নাই; কচিৎ কখনও দুই একজন ফকির বা দরবেশের মুখে এক আধটা দেহতত্ত্বের গান আমরা শুনিয়াছি। সে সকল গান কাহারও মনে ছিল না। পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বলিলেন "নূতন করিয়া গান প্রস্তুত করিতে হইবে।"··· অক্ষয়কুমার বলিলেন "তার জন্য ভয় কি? ধর্ ত জলদা, কাগজ; বাউলের গানই লেখা যাক।" আমি তখন কাগজ কলম লইয়া বসিলাম।··· অক্ষয়কুমার বলিলেন—

"ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশি, সত্য-পথের সেই ভাবনা।
যে পথে চোর ডাকাতে, কোন মতে, ছোঁবে না রে সোনা দানা;

সেই পথে মনোসাধে চল্ রে পাগল, ছাড় ছাড় রে ছলনা।
সংসারের বাঁকা পথে দিনে যেতে, চোর ডাকাতে দেয় যাতনা;
আবার রে ছয়টি চোরে ঘুরে ফিরে, লয় রে কেড়ে সব সাধনা।"

এই পর্য্যন্ত লেখা হইলেই অক্ষয় বলিলেন "এত দূর ত হোলো—তার পর?" তার পর—আবার কি? গানটা গাওয়া হবে। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "কথাটা বুঝিলে না। বাউলের গানের নিয়ম হচ্চে এই যে, গানের শেষ একটা ভণিতা দিতে হয়। কেমন?" অক্ষয় বলিলেন "সেই কথাই ত ভাব্‌ছি।" ... আমি বলিলাম "অত গোলে কাজ কি। গানটা নিয়ে কাঙ্গালের কাছে যাই, তিনি শেষ অন্তরা এবং ভণিতা ঠিক কোরে দেবেন।" অক্ষয় বলিলেন "তা হবে না; তাঁকে একেবারে Surprise (অবাক্) কোর্‌তে হবে। রও না, আমিই একটা নূতন নাম ঠিক কোরছি।" এই বলিয়া একটু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন "লেখ্‌ জলদা!" আমি কলম ধরিলাম, অক্ষয় শেষ অন্তরা বলিলেন—

"ফিকিরচাঁদ ফকির কয় তাই, কি কর ভাই, মিছামিছি পর ভাবনা
চল যাই সত্য পথে, কোন মতে, এ যাতনা আর রবে না।"

ব্যস্। গানের ভণিতা হইয়া গেল। সকলে একবাক্য স্বীকার করিলেন "ফিকিরচাঁদ" নামটা ঠিকই হইয়াছে। আমাদের ত ধর্ম্মভাব ছিল না, কোনও "ফিকিরে" সময় কাটানই আমাদের উদ্দেশ্য। "ফিকিরচাঁদ" নামের ইহাই ইতিহাস!...

সেই দ্বিপ্রহরে আমাদের মজ্‌লিসে যখন গানের রিহর্সেল দেওয়া শেষ হইল, তখন স্থির হইল গানটা একবার কাঙ্গালকে শুনাইতে হইবে। আমরা সকলে তখন দল বাঁধিয়া বাড়ীর মধ্যে

কাঙ্গালের জীর্ণ খড়ের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন কি যেন লিখিতেছিলেন। এত বড় একটা রেজিমেণ্টকে অসময়ে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি, তোদের আবার তর্ক বেধেছে না কি। তোদের জ্বালায় দেখ্‌ছি একটু স্থির হ'য়ে কাজ করবারও যো নেই। কি ব্যাপার বল্‌ ত?" তখন শ্রীমান্ অক্ষয় আমাদের মুখপাত্রস্বরূপ...বলিলেন "আমরা একটা বাউলের দল কোরবো। তার জন্য একটা গান লিখেছি।"

গানের কথা শুনিলে কাঙ্গাল সাত রাজার ধন হাতে পাইতেন। তিনি অমনি পরম উৎসাহে বলিলেন "গান লিখেচিস্? সুর বসানো হয়েছে?" প্রফুল্ল বলিলেন "সব হয়েছে, এখন শুধু আপনার শোনা বাকি।" তখন তিনি বলিলেন "বেশ, বেশ, সকলে মিলে গা দেখি।"

আমরা সকলে গান ধরিলাম। গানের মুখটুকু তিনি বসিয়া বসিয়াই শুনিলেন; তাহার পর যখন অন্তরা ধরা হইল, তখন আর তিনি বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া পড়িলেন। আমরা ত দাঁড়াইয়াই। তাহার পর গান আর নৃত্য—নৃত্য আর গান। সে এক অপার্থিব দৃশ্য।

শেষে গান থামিয়া গেলে কাঙ্গাল বলিলেন "দেখ, এই গানে দেশ ভেসে যাবে। তা একটা গান নিয়ে ত আর বাহির হওয়া যায় না। আমিও একটা গান দিই। অক্ষয়, কাগজ কলম ধর্‌ ত।"

তখন অক্ষয় কাগজ কলম ধরিলেন। কাঙ্গাল প্রথমে একটু গুণ গুণ করিয়া সুর ভাঁজিলেন, তাহার পর গাইতে লাগিলেন, অক্ষয় লিখিয়া লইতে লাগিল। তিনি গাইলেন—

"আমি কোরব এ রাখালী কত কাল।
পালের ছটা গরু ছুটে, কোরছে আমায় হাল-বেহাল।
আমি, গাদা কোরে নাদা পূরে রে, কত যত্ন ক'রে খোল বিচালি
খেতে দিই ঘরে ;
তারা ছটা যে গুখেকো গরু রে ; তারা, নরক খায় রে হামেহাল।
কাঙ্গাল কাঁদে প্রভুর সাক্ষাতে, তোমার রাখালী নেও আর পারিনে
গরু চরাতে ;
আমি আগে তোমার যা ছিলাম হে, আমায় তাই কর দীনদয়াল।"

এইটি দ্বিতীয় গান। এই দুইটি গান লইয়া প্রথম প্রেসের ভূতেরা সন্ধ্যার সময় গ্রামে বাহির হইলেন। সেই নিদাঘের সন্ধ্যার সময়ে যখন আলখেল্লা পরিধান করিয়া, মুখে কৃত্রিম দাড়ী লাগাইয়া, নগ্নপদে গ্রামবার্ত্তার প্রেস হইতে ভূতের দল বাহির হইল এবং খঞ্জনী, একতারা ও গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গান ধরিল—

"ভাব মন দিবানিশি—"

তখন সেই গান শুনিবার জন্য সমস্ত গ্রাম ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বৃদ্ধেরা অশ্রুবর্ষণ করিলেন।… কিন্তু দুইটি গানে লোকের পিপাসা মিটিল না ;…তখন শ্রীমান্ অক্ষয়কে আরও গান বাঁধিবার জন্য বলা হইল, অক্ষয় অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন "আমি আর গান বাঁধিব না, দেখিতেছ না এ গানে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। এখন কাঙ্গাল ব্যতীত এ স্রোতের মুখে আর কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না! এখন ইহার পশ্চাতে সাধনার বল থাকা চাই, নতুবা চলিবে না।"

অক্ষয় যখন জবাব দিলেন, তখন আমাদের ভূতের দলের সর্দার প্রসিদ্ধ গায়ক…প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অগ্রসর হইলেন ;…

প্রফুল্ল পনর মিনিটের মধ্যে একটা গান বাঁধিয়া ফেলিলেন।···
গানটি এই—

"ভাবী দিন কি ভয়ঙ্কর, ভেবে একবার, দেখ্ রে আমার মন পামরা।
১। আত্মীয় ডাক্তার বদ্দি, নিরবধি, ঔষধ আদি দেবে তারা,
যখন তোর হাত ধরিতে, তর্জ্জনীতে, না করিবে নড়াচড়া।
২। যখন তোর সবশ অঙ্গ অবশ হয়ে, প'ড়ে রবে ধ'রে ধরা।
যখন তোর আত্মলোকে, ডেকেডুকে না পাইবে কথার সাড়া।
৩। যে গলার মধুর স্বরে, জগতেরে মাতাস্ ওরে ঘাটেপড়া;
তখন তোর সেই স্বরেতে থেকে থেকে রব করিবে ঘড়াৎঘড়া।
৪। তাই বলি, যাই দেখি চল্ সত্যপথে নিত্য-নগরেতে মোরা,
শুনেছি সেই ধামেতে এইরূপেতে মরে না রে মানুষ যারা।"

প্রফুল্লচন্দ্র এই গানটি রচনা করিলেন বটে, কিন্তু তিনি ইহাতে কোন ভণিতা দিলেন না।···তৃতীয় দিনে যখন এই গানটি লইয়া ফকিরের দল গ্রামে বাহির হইলেন, তখন এই গান শুনিয়া লোকে একেবারে অধীর হইয়া গেল।···কাঙ্গালের কুটীর হইতে গানের দল বাহির হইয়া যখন বাজারে পৌছিল তখন লোকারণ্য;···আমি অনেক দিন এমন জন-সমারোহ দেখি নাই। আর বলিতে কি, এমন প্রাণস্পর্শী গানও আমি কখনও শুনি নাই। এখনও আমার নয়নসম্মুখে সেই দৃশ্য বর্ত্তমান দেখিতেছি। সে আজকালকার কথা নহে। ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল বাঙ্গালা ১২৮৭ সালে প্রথম গঠিত হয়।···

এই ফিকিরচাঁদের গান সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার তৎসময়ের দিনলিপিতে যে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা আমি এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কাঙ্গাল লিখিতেছেন—

"শ্রীমান্ অক্ষয় ও শ্রীমান্ প্রফুল্লের গানগুলির মধ্যে আমি যে মাধুর্য্য পাইলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, এই ভাবে সত্য, জ্ঞান ও প্রেম-সাধনতত্ত্ব প্রচার করিলে, পৃথিবীর কিঞ্চিৎ সেবা হইতে পারে। অতএব কতিপয় গান রচনার দ্বারা তাহার স্রোত সত্য, জ্ঞান ও প্রেম-সাধনের উপায় স্বরূপ পরমার্থপথে ফিরাইয়া আনিলাম এবং ফিকিরচাঁদের আগে 'কাঙ্গাল' নাম দিয়া দলের নাম 'কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদ' রাখিয়া তদনুসারেই গীতাবলীর নাম করিলাম। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ-ফকিরের দলস্থ গায়কেরা বাউল সম্প্রদায়ের ন্যায় বেশ ও পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হৃদয় যতই পবিত্র হইতে লাগিল, ততই সত্য, জ্ঞান, ও প্রেমময় গীতি সকল উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয়ক্ষেত্র সত্য, জ্ঞান, ও প্রেমানন্দে পূর্ণ করিতে লাগিল। দলস্থ যাঁহারা যতদূর পবিত্রতা রক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ কৃত বিষয়ে ততদূর এক আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদের গান নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীর লোকের আনন্দকর হইয়া উঠিল। মাঠের চাষা, ঘাটের নেয়ে, পথের মুটে, বাজারের দোকানদার এবং তাহার উপর শ্রেণীর সকলেই প্রার্থনা সহকারে ডাকিয়া কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের গান শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু নানা কারণে দেশস্থ কয়েক জন প্রধান ব্যক্তি বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন এবং নানা প্রকারে হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিতে লাগিলেন। আমি একাকী সকল আঘাত সহ্য করিতে

লাগিলাম। তিলার্দ্ধ মাত্রও অবসর নাই। সংসারধর্ম্ম ও সংসারধর্ম্মের অতীত পরমার্থ পর্য্যন্ত, যিনি কেন যে কার্য্য না করুন, জগৎ তাহার প্রতিবাদ করিবে। প্রতিবাদ আছে বলিয়া এ জগতে এখনও কিছু দৃঢ়তা পবিত্রতা রহিয়াছে; অন্যথা ইহাও থাকিত না। কৃত কার্য্যে যতই প্রতিবাদ হইতে থাকে, কার্য্যে ততই স্বতঃ দৃঢ়তা জন্মে। যিনি ফিকির করিয়া, হাপরে স্বর্ণ দগ্ধ করিয়া খাঁটি করিবার জন্য আমাকে এইরূপ দগ্ধ করিতেছেন, বিরলে কেবল তাঁহার উদ্দেশে ক্রন্দন করিয়া চক্ষের জলে বক্ষদেশ ভাসাইতে লাগিলাম।"

ফিকিরচাঁদের গান আর আমাদের ক্ষুদ্র কুমারখালী গ্রামে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না।...সকলেরই অনুরোধ, তাহাদের গ্রামে একবার ফিকিরচাঁদের দলের পদার্পণ করিতে হইবে। শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার...রাজসাহী চলিয়া গেলেন। আমিও কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলাম।...আমরা তখন বাহিরে পড়িয়া গেলাম। ফিকিরচাঁদের গানের দলের ব্যবস্থার ভার কাঙ্গালের উপরই পড়িল।...

এইরূপে বাউল-সঙ্গীতের স্রোত বহিতে লাগিল। নূতন নূতন গান রচনা করিয়া লোকের মন পরিতৃপ্ত করা এক হরিনাথেরই সাধ্য। "কাঙ্গাল" ভণিতায় হরিনাথ একাই অধিকাংশ গান রচনা করিতে লাগিলেন।

ফিকিরচাঁদের বাউল-সঙ্গীতগুলি সাধারণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এগুলি সহজ সরল ভাষায় রচিত ও

সাধারণের আয়ত্তাধীন সুরে গীত হইত। আমরা কয়েকটি বাউল-সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি :—

১

ওহে, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা, ডাক্‌ছি হে, তোমারে॥
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে
(ওহে, আমায় কি পার করবে নাহে, আমায় অধম বলে)
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে॥
যাদের পথ সম্বল, আছে সাধনার বল,
(তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে)
(আমি সাধনহীন তাই রইলেম পড়ে হে)
তাঁরা নিজ বলে গেল চলে, অকূল পারাবারে॥
শুনি, কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার,
(আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে)
(দয়াময়! নামে ভরসা বেঁধে হে)
আমি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে॥
আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল,
(তাই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে)
(তাই অধমতারণ বলে ডাকি হে)
ফিকির কেঁদে আকুল, পড়ে অকূল সাঁতারে পাথারে॥

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে।
তবে কি মা, এমন করে, তুমি লুকায়ে থাক্‌তে পারতে।

আমি নাম জানিনে, ডাক জানিনে,
আবার পারি না মা, কোন কথা বল্‌তে ;
তোমায়, ডেকে দেখা পাইনে তাইতে, আমার জনম গেল কান্‌তে ॥
দুঃখ পেলে মা, তোমায় ডাকি,
আবার, সুখ পেলে চুপ্‌ ক'রে থাকি ডাক্‌তে ;
তুমি মনে বসে, মন দেখ মা, আমায় দেখা দাও না তাইতে।
ডাকার মত ডাকা শিখাও,
না হয়, দয়া করে দেখা দাও আমাকে ;
আমি, তোমার খাই মা, তোমার পরি, কেবল ভুলে যাই নাম করতে ॥
কাঙ্গাল যদি ছেলের মত,
মা তোর, ছেলে হ'ত তবে পার্‌তে জান্‌তে ;
কাঙ্গাল, জোর ক'রে কোল কেড়ে নিত, নাহি সর্‌ত বল্লে সর্‌তে ॥

৩

অরূপের রূপের ফাঁদে, পড়ে কাঁদে, প্রাণ আমার দিবানিশি।
কাঁদলে নির্জ্জনে ব'সে, আপনি এসে, দেখা দেয় সে রূপরাশি ;
সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ, শত শত সূর্য্য শশী।
যদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে, সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি,
আবার রে তারায় তারায়, ঘুরে বেড়ায়, ঝলক লাগে হৃদে আসি।
হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি, বেঁধে রাখি, চিরদিন সেই রূপশশী ;
ওরে, তায় থেকে থেকে, ফেলে ঢেকে, কুবাসনা মেঘরাশি।
কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, দয়া করে দেখা দেয় রে ভালবাসি ;
আমি যে সংসার মায়ায়, ভুলিয়ে তাঁয়, প্রাণ ভরে কৈ ভালবাসি।

৪

দেখ ভাই জলের বুদ্‌বুদ্‌, কিবা অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজি কেউ পাদ্‌সা হয়ে, দোস্ত লয়ে, রংমহলে করছে.খেলা ;
কাল আবার সব হারায়ে, ফকীর হয়ে, সার করেছে গাছের তলা।
আজি কেউ ধনগরিমায়, লোকের মাথায়, মারছে জুত এরিতলা ;
কাল আবার কোপ্‌নী প'রে, টুক্‌নী ধরে, কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা।
আজ রে যেখানে সহর, কত নহর, বসিয়াছে বাজার মেলা ;
কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি, করছে রে তরঙ্গ-খেলা।
কাঙ্গাল কয় পাদ্‌সা উজীর, কাঙ্গাল ফকীর, সকলি ভাই ভোজের খেলা
মন তুমি যখন যা হও, ঠিক পথে রও, ধর্ম্মকে ক'র না হেলা।

৫

বচ্ছে ভবনদীর নিরবধি খরধার।
দেখ, ক্ষণকাল বিরাম নাই এই দরিয়ার ॥
ডিঙ্গা ডেঙ্গি পিনাশ বজ্‌রা, মহাজনী নৌকায়,
পাপী তাপী সাধু ভক্ত, চড়নদার তার সমুদায়।
ভাসিছে দরিয়ার জলে, ইচ্ছামত নৌকা চলে ;
হাল ধ'রে তার স্থকৌশলে, বসে আছে কর্ণধার ॥ মন সবার,
কর্ণধারের ইচ্ছামত, কেহ চলে উজায়ে,
মনের সুখে জ্ঞান মাস্তুলে, ভক্তিপাল উড়ায়ে।
কেহ আবার মনের দোষে, ভেটেনেতে যাচ্ছে ভেসে
পাকে ফেলে অবশেষে, ডুবায় তরি কর্ণধার ॥ মন সবার,
কেহ আবার ক্রমাগত বলে বলে ভাটিয়ে,
অপার সাগরে, পড়ে নদীর মুখ ছাড়িয়ে।

সাগরের তরঙ্গ ভারি, স্থির নাহি থাকে তরি,
লোণা জলে জীর্ণ করি, ডুবায় তরি কর্ণধার ॥ মন সবার,
সাধু মহাজন যত, বাদাম তুলে দরিয়ায়,
সুবাতাসে চলে তারা, মুখে নামের সারি গায়।
ঠিক না থাক্‌লে হালি, অম্‌নি নৌকা করে গালি,
গুপ্ত চড়ায় চোরা বালি, ডুবায় তরি কর্ণধার ॥ মন সবার,
কাঙ্গাল বলে কাঙ্গালের পুঁজি পাটা যা ছিল,
বারে বারে ডুবে ভবে, সকলি ত খোয়াল।
খাবি খেয়ে অনেক কাল, আবার তুলে দিলাম পাল,
সাবধানে ধর হাল, বিনয় করি কর্ণধার ॥ মন আমার,

৬

শূন্য ভরে একটি কমল আছে কি সুন্দর!
নাই তার জলে গোড়া, আকাশ-জোড়া, সমান ভাবে নিরন্তর ॥
কমলের সহস্রেক দল,
তাতে বিরাজ করে, সোনার মাণিক, কিবা সে উজ্জ্বল,
তারে যে জেনেছে, যে পেয়েছে, সেই হয়েছে দিগম্বর ॥
কমলের ডাঁটাতে কাঁটা,
আবার ছয়টি সাপে, জড়িয়ে ধ'রে করেছে লেঠা,
কেবল পায় রে দেখা, যারা বোকা, সাপের ফণা ভয়ঙ্কর ॥
ফিকিরচাঁদ ফকীরে বলে,
সেই সাপকে ধরে, বশ করেছে, যে জন কৌশলে,
কেবল সে পেয়েছে, নিজের কাছে, সোনার মাণিক মনোহর ॥
(হায় রে পাগল)

শেষ জীবন

হরিনাথের শেষ জীবনের কথা আমরা তাঁহার প্রিয়শিষ্য অক্ষয়কুমারের ভাষায় বর্ণনা করিব। অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন :—

হরিনাথ আবাল্য ধর্ম্মানুপ্রাণিত হৃদয়ে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন। যৌবনে স্বদেশসেবায় নিযুক্ত থাকিবার সময় যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম একটি ক্ষুদ্র কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

পাপেতে পৃথিবী থায়।
ধর্ম্ম তথা নাই আর॥
অনেকে "মিলের" ছাত্র।
ধর্ম্ম কর্ম্ম কথা মাত্র॥
কপটতা ধর্ম্ম সাজে।
পৃথিবী ঢাকিয়া আছে॥
ধর্ম্ম যদি চাও ভাই।
ধর্ম্মসাজে কাজ নাই॥
কপটতা পরিহর।
ভাল হও ভাল কর॥

এই আদর্শ হইতে প্রাণে যে ধর্ম্মানুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেই শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। এক দিনের জন্যও তাঁহার লেখনী বিশ্রাম লাভ করে নাই 'ব্রহ্মাণ্ডবেদ" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ মাঝে মাঝে তাঁহার সাধনতত্ব

প্রকাশ করিত, এবং ক্ষয়রোগে শয্যাশায়ী হইয়াও মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে "মাতৃমহিমা" নামে একখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ২২শে চৈত্র তাঁহার মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া যে শেষ উপদেশকবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই মুমূর্ষু সাহিত্যসেবকের প্রাণের নিবেদন প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে! সেই শেষ উপদেশ এখনও যেন কর্ণোপান্তে ধ্বনিত হইতেছে,—

আগেও উলঙ্গ দেখ, শেষেও উলঙ্গ।
মধ্যে দিন দুই কাল বস্ত্রের প্রসঙ্গ॥
মরণের দিন দেখ সব ফক্কিকার।
তবে কেন মূঢ় মন কর অহঙ্কার॥
আমি ধনী আমি জ্ঞানী মানী রাজ্যপতি।
শ্মশানে সকলের দেখ একরূপ গতি॥
কেবা রাজা, কেবা প্রজা, কে চিনিতে পারে।
তবে কেন মর জীব ধন-অহঙ্কারে॥
পুঁথি পড, পাঁজি পড কোরাণ পুরাণ।
ধর্ম্ম নাই এ জগতে সত্যের সমান॥
সত্য রাখি কর কর্ম্ম সংসার পালন।
পাপ নাহি হবে দেহে মৃত্যুর কারণ॥
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু সকলেই জানে।
লোভের ধাঁধায় প'ড়ে কেহ নাহি মানে॥
না মানে কুবুদ্ধি, লোক মনে ভরা মল।
আগুনে পুড়িয়া মরে পতঙ্গের দল॥

মায়ের সমান নাই শরীরপালিকা।
ভার্য্যার সমান নাই শরীরতোষিকা॥
আনন্দ কারণ দেখ বালক বালিকা।
সর্ব্বদুঃখহরা দুর্গা রাধিকা কালিকা॥

৫ই বৈশাখ ১৩০৩ (১৬ এপ্রিল ১৮৯৬) পুণ্য অক্ষয়-তৃতীয়ায় ৬৩ বৎসর বয়সে কাঙ্গাল হরিনাথ সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন

সংশোধন ও সংযোজন

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১১ : তারাশঙ্কর তর্করত্ন

পৃ. ১৬—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে তারাশঙ্করের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্থলে ১৫ নবেম্বর ১৮৫৮ তারিখে শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ১৫০৲ বেতনে নদীয়ার ডেপুটি ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ-বিষয়ে Report on Public Instruction in Bengal, 1866-67, App. A, p. 7 দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১২ : অক্ষয়কুমার দত্ত

পৃ. ৩৩—'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ২য় ভাগের প্রকাশকাল—ইং ১৮৫৩, ভ্রমক্রমে ইং ১৮৫২ মুদ্রিত হইয়াছে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২৩ : মধুসূদন দত্ত

পৃ. ৯০—মধুসূদনের ঢাকা গমনের তারিখ "১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি (?)" বলা হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। মধুসূদন ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে—খুব সম্ভব সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় গিয়াছিলেন। ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৭১ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' ঢাকার 'হিন্দু হিতৈষিণী' হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

"গত শনিবার ঢাকায় জ্ঞানকরী সভায় বহু-বিবাহ নিবারণ বিষয়ের আন্দোলন হয়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় মনুবচনে বহুবিবাহের ব্যবস্থার সূত্র উল্লেখ করিয়াছিলেন। তথায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, দত্তজ মহাশয়

যথাবিধি শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া তাহা বুড়ীগঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।"

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩০ : মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ

পৃ. ৩০—'**আরবীয়োপাখ্যান**' পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

পঞ্চম খণ্ডের প্রকাশকাল—১৭৭৯ শক, পৃ. ৩৪০।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩১ : যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

যোগেন্দ্রনাথের আরও তিনখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি :—

১। **চৌকিদার-দর্পণ**। জ্যৈষ্ঠ ১৩০২। পৃ. ৪৯।

২। **বীরপূজা (১)**। ১০ মার্চ ১৯০০। পৃ. ১২।

রামতনু লাহিড়ী ও রাজনারায়ণ বসু।

৩। **বীরপূজা (২)**। ২২ মে ১৯০০। পৃ. ৪৬।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত; প্যারীচরণ সরকার ও প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; কেশবচন্দ্র সেন।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩. : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রনাথের আর. একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিতে ভুল হইয়াছে, উহা বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ইন্দ্রনাথ-কৃত সরল ব্যাখ্যা ও টীকা সমেত—

খাজানার আইন অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইন। পৌষ ১২৯২। পৃ. ১৭৬।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২৯
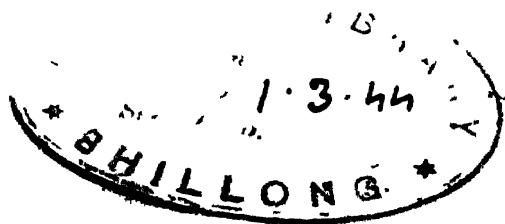
মীর মশার্‌রফ হোসেন

১২৫৪—১৩১৮

মীর মশার্‌রফ হোসেন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৫০
মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২২—২১।৮।১৯৪৩
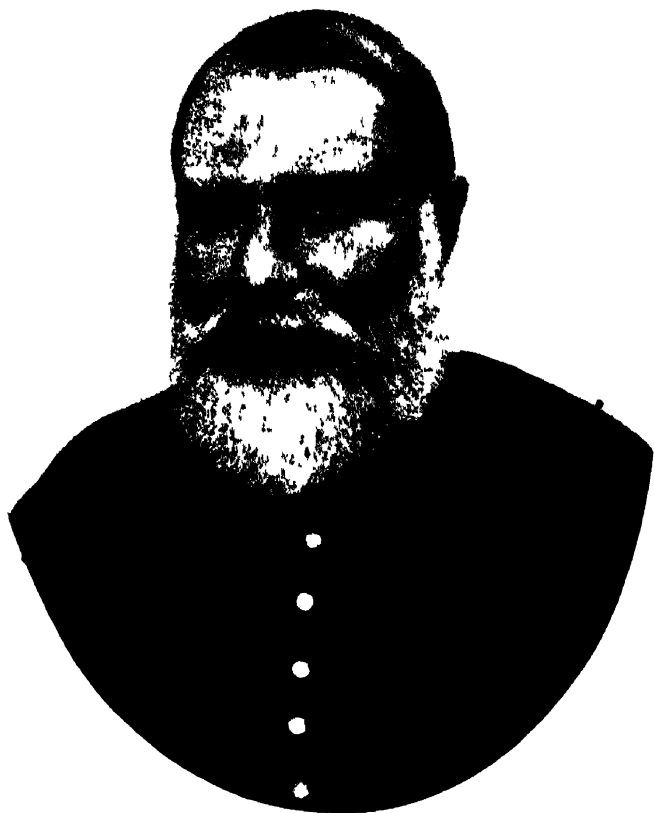
মীব মশারবফ হোসেন

বাংলা দেশে বাংলা-সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের দান সম্পর্কে যদি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা চলে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এক দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে স্থান, অন্য দিকে 'বিষাদ-সিন্ধু'-প্রণেতা মীর মশাররফ হোসেনের স্থান ঠিক অনুরূপ। এ দেশের মুসলমান সমাজে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য-শিল্পী, এবং এখন পর্য্যন্ত তিনিই প্রধান সাহিত্য-শিল্পী হইয়া আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' বাংলা দেশের ঘরে ঘরে যেমন এককালে পঠিত হইয়াছিল, 'বিষাদ-সিন্ধু' তেমনই আজও পর্য্যন্ত জাতীয় মহাকাব্যরূপে বাঙালী মুসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হয়; বাংলা-সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ্ হিসাবে সকল সমাজেই এই গদ্যকাব্যখানির সমান আদর। আর একটি কথা, আজ তাঁহার সম্পর্কে আমাদের স্মরণীয়—তিনি জীবনে এবং সাহিত্যে সকল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে ছিলেন, হিন্দু মুসলমান—বঙ্গমাতার এই দুই বিবদমান সন্তানের মিলন-সাধনের জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা এমনই উচ্চশ্রেণীর ছিল যে, সুদূর অতীতের কারবালা-প্রান্তরের ট্র্যাজেডিকে তিনি সমগ্র বাংলাভাষাভাষীর ট্র্যাজেডি করিয়া

তুলিতে পারিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই মীর মশার্‌রফ হোসেনকে আজ আমরা নামে মাত্র চিনি, তাঁহার জীবনীর এবং জীবনের সকল কীর্ত্তির পরিচয় তাঁহার স্বসমাজের লোকও রাখেন না। তাঁহার রচিত সকল পুস্তক আমরা প্রভূত চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই ; যেখানে যেখানে সেগুলি রক্ষিত হওয়া উচিত ছিল, দুঃখের বিষয়, সেখানে সেগুলি নাই। আমরা অনেক কষ্টে বাংলা দেশের এই প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছি। ইহা পাঠে উপযুক্ত লোক আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

জন্ম ; ছাত্র ও কর্ম্ম-জীবন

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার গৌরীতটস্থ লাহিনীপাড়া গ্রামে মীর মশার্‌রফ হোসেনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মীর মুয়াজ্জম হোসেন। ইঁহাদের বংশমর্য্যাদা ও বংশপরিচয়ের উপাধি—সৈয়দ ; কার্য্যের পারদর্শিতা অনুসারে রাজদত্ত উপাধি —মীর। মশার্‌রফ শৈশবে জগমোহন নন্দীর পাঠশালায় বাংলা শিক্ষা করেন। তাহার পর কিছু দিন কুষ্টিয়ার ইংরেজী-বাংলা স্কুলে এবং এক বৎসর পদম্‌দীর নবাব-স্কুলে পড়াশুনা করেন। অতঃপর তিনি পিতার নির্দ্দেশে কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন ; উমেশচন্দ্র দত্ত তখন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ। কিছু দিন পরে তিনি সঙ্গীদের সহিত কলিকাতা

বেড়াইতে আসেন এবং পিতৃবন্ধু নাদির হোসেনের (তৎকালে আলিপুরের আমীন) চেতলার বাসায় কয়েক দিন অবস্থান করেন। ইহার অল্প দিন পরেই নাদির হোসেনের আগ্রহাতিশয্যে, মুয়াজ্জম হোসেন পুত্রকে বন্ধুর বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতে অনুমতি দেন। চেতলায় অবস্থানকালে নাদির হোসেনের প্রথমা কন্যা লতিফ-উন্-নিসার সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ গোপনে স্থির হয়। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে, তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বে, হোসেন সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা আজীজ-উন্-নিসার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় (১৯ মে ১৮৬৫)। ইহার আট বৎসর পরে তিনি বিবি কুলসুমকে বিবাহ করেন (মাঘ ১২৮০)।

মশার্রফ হোসেন জীবনের বেশীর ভাগ সময় ফরিদপুরের নবাব এস্টেটে ও ১২৯১ সাল হইতে দেলদুয়ার এস্টেটে ম্যানেজারের পদে কাজ করিয়াছিলেন।

সাহিত্য-সেবা

মীর মশার্রফ হোসেন দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল বাংলা-সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'বিষাদ-সিন্ধু', 'গো-জীবন', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ও 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' বাংলা-সাহিত্য-সমাজে বিশেষ সুপরিচিত। প্রকৃতপক্ষে বাংলা-সাহিত্যে মশার্রফ হোসেনের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ১৩০৮ সালের পৌষ সংখ্যা 'প্রদীপে' মীর সাহেবের একখানি

পুস্তক সমালোচনাকালে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সত্যই লিখিয়াছিলেন :—

মীর সাহেবের পূর্ব্বে মুসলমানলিখিত বঙ্গসাহিত্যে কবিতা ছিল, পড়িবার মত গদ্য ছিল না। এখন অনেকে সুখপাঠ্য গদ্য গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, মুসলমান গদ্যলেখকবর্গের মধ্যে এখন পর্য্যন্তও মীর সাহেব সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক বলিয়া পরিচিত। ইনি অদ্যাপি সাহিত্যসেবায় ব্যাপৃত আছেন। কুষ্টিয়ানিবাসী মীর মশারফ হোসেন বাল্যকাল হইতেই বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত অনুরক্ত। কাঙ্গাল হরিনাথ ইঁহার সাহিত্য-গুরু; প্রথমে 'গ্রামবার্ত্তা'য় পরে 'প্রভাকরে' লিখিয়া লিখিয়া লেখা শিখিয়া, মীর সাহেব 'আজিজন্ নেহার' নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন। মুসলমানসম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে তাঁহাই সর্ব্বপ্রথম বলিয়া পরিচিত। তাহার পর বহু গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গীয় লেখকবর্গের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। কুষ্টিয়া একদা নীলবিগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার যথার্থ কাহিনী মীর সাহেব 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' নামক এক বিচিত্র উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পল্লীনিবাসী মুসলমান লেখক কিরূপ ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা সবিশেষ কৌতূহলপূর্ণ। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে দেশে এত কাগজ ছিল না, এত গ্রন্থ ছিল না, এত মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, ছিল গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বা দুই একটি বঙ্গবিদ্যালয়, দুই চারিখানি কলেজ এবং দুই দশখানা ভাল পুস্তক। তৎকালে একজন মুসলমানের পক্ষে ভাল বাঙ্গালা রচনা করিবার বহু বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া মীর মশারফ

হোসেন যে সাহিত্য-শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।*

জলধর সেন তাঁহার 'কাঙ্গাল হরিনাথ' (১ম খণ্ড, ১৩২০) পুস্তকে মীর মশার্‌রফ হোসেন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

মীর মশারফ হোসেন…কাঙ্গালের সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন। মীর সাহেবের বাড়ী কুমারখালীর অনতিদূরে গৌরী নদীর তটে

* ছাত্রাবস্থা হইতেই মশার্‌রফ হোসেন বাংলা লিখিতে সুরু করেন। তাঁহার লিখিত 'আমার জীবনী'তে প্রকাশ:—"কলিকাতার সংবাদপ্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহিত পত্রে পত্রে লেখাশুনা যেরূপ হইতে পারে তাহা আছে। আমি অনেক সংবাদ তাঁহাদের কাগজে লিখিতাম। তাঁহারাও দয়া করে ছাপাইতেন। আমাকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—"আমাদের কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা," কেউ জানিত না যে আমি প্রভাকর পত্রিকায় কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা।—সাদাসিদা ভাবে লিখিতাম। ভুবন বাবু কাটিয়া ছাঁটিয়া প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া দিতেন। কোন কোন সংবাদ বাদও দিতেন। সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া পাঠাইতাম। কুমারখালিতে সে সময়ে গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা প্রকাশ হইত। কুমারখালি, আমার বাটী হইতে নিকটে। গ্রামবার্ত্তা সম্পাদক বাবু হরিনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। আমিও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করিতাম। সপ্তাহে সপ্তাহে গ্রামবার্ত্তায় সংবাদ লিখিতাম। প্রভাকরেও লিখিতাম। মজ্জারপুরে [যশোহরে] বসিয়া বসিয়া থাকি কোন কাজকর্ম্ম নাই।—সংবাদ সংগ্রহ করিয়া নিয়মিতরূপে লিখিতে আরম্ভ করিলাম। হরিনাথবাবু কপতক্ষ নদীর অবস্থা লিখিতে পত্র লিখিলেন, এক এক দিন বহুদূর নৌকা করিয়া দেখিয়া আসিয়া লিখিতাম। তিনি কাটিয়া ছাঁটিয়া নিজ কাগজে প্রকাশ করিতেন। এদিকে হরিনাথ বাবু আর কলিকাতার দিকে ভুবনবাবু আমার সামান্য লিখা সংশোধন করিয়া প্রভাকরে, প্রকাশ করা আরম্ভ করিলেন।"

লাহিনীপাড়া গ্রামে। জাতিতে মুসলমান হইলেও তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া ভক্তি করিতেন। কাঙ্গাল হরিনাথ মীর মশারফ হোসেনকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং বাঙ্গালা লেখা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন। এই উৎসাহের ফলেই মীর সাহেব বাঙ্গালা-সাহিত্যের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হইয়াছিলেন। তাঁহার 'বিষাদ-সিন্ধু' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। মীর মশারফ কাঙ্গালের প্রকাশিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকার লেখক ছিলেন। আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম তখন প্রতি সপ্তাহে মীর সাহেবের লেখা পড়িবার জন্য যে কত আগ্রহ হইত তাহা বলিতে পারি না। তিনি প্রবন্ধের নিম্নে নিজের নাম দিতেন না,—লিখিতেন "গৌরীতটবাসী মশা"। এই 'মশা'র লিখিত গদ্য-পদ্য সন্দর্ভ পাঠ করিয়া আমরা যে কত উপকৃত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার 'গৌরী সেতু', তাঁহার 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', তাঁহার 'গাজি মিঞার বস্তানি' আর তাঁহার অমূল্য রত্ন 'বিষাদ-সিন্ধু' যে আমরা কতবার পড়িয়াছি তাহার সংখ্যা করা যায় না। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য কত পরিশ্রম করিয়াছেন। আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে নীলবিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেক 'নোট' দিয়া যাইব, তুমি একখানি ইতিহাস লিখিও। আমি এ বয়সে

(পৃ. ৩৩৬-৩৭) ইহা ১৮৬৫ সালের মে মাসে তাঁহার বিবাহের দুই-তিন মাস পূর্ব্বেকার কথা। এই সময় 'সংবাদ প্রভাকরে' তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি লিখিয়াছেন :—"প্রভাকরে এক প্রবন্ধ লিখিলাম। মুসলমানের বিবাহপদ্ধতি—মনের কথা যাহা মনে উদয় হইল; যেরূপ বিবাহ হইয়া থাকে তাহার দোষ ধরিয়া যথাসাধ্য লিখিলাম।" ('আমার জীবনী', পৃ, ৩৩৯)

আর পারিলাম না।" আলস্য বশতঃ সে 'নোট'ও লওয়া হইল না। তিনিও আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া দুই বৎসর হইল সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। (পৃ. ৩৮-৩৯)

মশার্‌রফ হোসেন সঙ্গীত-রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত একটি অপূর্ব্ব বাউল-সঙ্গীত জলধরবাবু 'কাঙ্গাল হরিনাথ' পুস্তকের ১ম খণ্ডে (পৃ. ৩৯-৪০) উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

একদিন মীর মশারফ হোসেন কুমারখালীতে কাঙ্গালের কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং ফিকিরচাঁদের দলকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কাঙ্গাল সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "দলের নিয়মানুসারে দলের লোকেরা তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না। তোমার বাড়ীতে গান শেষ করিয়া দলের লোকেরা সেই রাত্রিতেই বাড়ী ফিরিয়া আসিবেন; তোমার বাড়ীতে তাঁহারা এক ছিলিম তামাকও খাইবেন না।" মশারফ বলিলেন "সে কি রকম কথা! তা কি হয়?" কাঙ্গাল বলিলেন "তবে তুমি যদি এই দলভুক্ত হও, তবে তাঁহারা তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন।" মশারফ হাসিয়া বলিলেন "আমি ত গান করিতে জানি না।" কাঙ্গাল উত্তর করিলেন "গান করিতে জান না বটে, কিন্তু গান ত লিখিতে জান।" মীর মশারফ বলিলেন, "তাহা হইলে আমি দলভুক্ত হইলাম। এখনই গান লিখিয়া দিয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি তখনই গান লিখিতে বসিলেন। আমরা সেই গানটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম; মীর

সাহেব এই দলের জন্য আর কোনও গান পরে দেন নাই। গানটী এই—

"রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।

১। এই যে আমার আমার, সব ফক্কিকার, কেবল তোমার নামটী রবে;
হবে সব লীলা সাঙ্গ, সোনার অঙ্গ ধুলায় গড়াগড়ি যাবে।

২। সংসারের মিছে বাজি, ভোজের বাজি, সব কারসাজি ফুরাইবে;
তখন রে এক পলকে, তিন ঝলকে, সকল আশা ঘুচে যাবে।

৩। তোমার এই আত্মস্বজন, ভাই পরিজন, হায় হায় ক'রে কাঁদবে সবে;
তারা ত পেয়ে ব্যথা, ভাঙ্গবে মাথা, তুমি কথা না কহিবে।

৪। তোমার সব টাকাকড়ি, ঘর বাড়ী, ঘড়ি গাড়ী পড়ে রবে;
আবার রে পা থাকিতে, হাত রহিতে, পরের কাঁধে যেতে হবে।

৫। আগে যে ক'রে হেলা, গেল বেলা, সন্ধ্যাবেলা আর কি হবে;
জগতের কারণ যিনি, দয়ার খনি, তিনিই 'মশা'র ভরসা ভবে।"

মীর মশার্‌রফ হোসেনের রচিত পুস্তকের সংখ্যা বড় অল্প নহে। আমরা তাঁহার সকল পুস্তক দেখি নাই। যেগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, প্রকাশকাল সহ সেগুলির একটি তালিকা নিম্নে দিলাম :—

১। **রত্নবতী**। (উপন্যাস) শ্রাবণ, ১২৭৬ (ইং ১৮৬৯)। পৃ. ৬১।

রত্নবতী / কৌতুকাবহ উপন্যাস / শ্রীমীর মসারফ হোসেন প্রণীত / গাঁথিয়া কল্পনাসূত্রে, নব-গজহার। / সঁপিলাম বন্ধুগলে, নব-উপহার। / নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র। / কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯ / সং ১৯২৬

গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপন" নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

রত্নবতী প্রথমবার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। একটী কৌতুকাবহ গল্প অবলম্বন করিয়া ইহার রচনা কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। আজকাল অনেকানেক সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার অনুবাদের পক্ষপাতী হইয়া সে বিষয়ের রস প্রায় একচেটিয়া করিয়াছেন। আমি সে পথের পথিক না হইয়া যথাসাধ্য এই গল্পটি কল্পনা করিয়াছি। ভাষা-সঙ্গতি ও গল্পের বন্ধন যতদূর পারিয়াছি, সামঞ্জস্য রাখিতে ত্রুটি করি নাই। গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার নামে পরিচয় দেওয়া এই আমার প্রথম উদ্যম। অতএব ইহার মধ্যে শত শত দোষ বিদ্যমান থাকা সম্ভব। ভরসা করি, গুণজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ সে ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে সকলে এক একবার ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলেই আমার শ্রম সফল হয়। শ্রীমীর মসারফ হোসেন। কুষ্টিয়া,—লাহিনীপাড়া। ৩০এ শ্রাবণ,—১২৭৬

চৈতন্য লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

২। **বসন্তকুমারী নাটক**। মাঘ ১২৭৯ (ইং ১৮৭৩)। পৃ: ১২৭।

ইহা গ্রন্থকারের "অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম"।

৩। **জমীদার দর্পণ**। (নাটক) চৈত্র ১২৭৯ (ইং ১৮৭৩)। পৃ. ৭২।

নাটকখানির "প্রস্তাবনা" অংশ হইতে সূত্রধার ও নটের কথোপ-কথনের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

সূত্র।...কলিকালে প্রজারা মহা সুখে আছে। কলিরাজও প্রজার সুখ-চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যস্ত; কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে সুখে থাকবে, এরি সন্ধান ক'র্চ্ছেন। কিন্তু চক্ষের আড়ালে দুর্ব্বলের প্রতি

সবলেরা যে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য ক'র্চ্ছে তার খোঁজ খবর নেই।

নট। কেন এ আপনার নিতান্তই ভুল। রাজার নিকট সবল দুর্ব্বল, ছোট বড়, ধনী নির্ধনী, সুখী দুঃখী, সকলি সমান। সকলি সম স্নেহের পাত্র। সকলের প্রতিই সমান দয়া। আজকাল আবার দীন দুঃখীদের প্রতিই বেশী টান।

সূত্র। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধে) আচ্ছা মফস্বলে এক রকম জানওয়ার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ সহরেও বাস করে, সহরে কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর! সহরে তাদের কেউ চেনে না; মফস্বলে দোহাই ফেরে। সহরে কেউ কেউ জানে যে এ জানওয়ার বড় শান্ত—বড় ধীর, বড় নম্র; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শৃগাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্য্যন্ত পার পায় না! ব'লব কি, জানওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।

নট। কি কথাই ব'ল্লেন, বাঘ বুঝি আর জানওয়ার নয়?

সূত্র। আপনি বুঝ্‌তে পারেন নাই। এ জানওয়ারদের চারখানা পাও নাই—লেজও নাই। এরা খাসা পোসাক পরে, দিব্বি সরু চেলের ভাত খায়। সাড়ে তিন হাত পুরু গদীতে বসে, খোসামোদে কুকুরেরাও গদীর আশে পাশে ল্যাজ গুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে। কিছুরই অভাব নাই, যা মনে হ'চ্ছে তাই ক'র্চ্ছে। বিনা পরিশ্রমে সচ্ছন্দে মনের সুখে কাল কাটাচ্ছে। জানওয়ারেরা অপমান ভয়ে নিজে কোন কার্য্যই করে না। ভগবান তাদের হাত পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সকলি অকেজো। দিব্বি পা আছে অথচ হাঁট্‌বার শক্তি নাই। দেখ্‌তে খাসা হাত, কিন্তু খাদ্য সামগ্রী হাতে ক'রে মুখে তুলতেও কষ্ট হয়। কি করে? আহারের সামগ্রী প্রায় চাকরেই চিবিয়ে দেয়! এরা আবার দুই দল।

নট। দল আবার কেমন?

সূত্র। যেমন হিন্দু আর মুসলমান।

নট। ঠিক বলেছ। ঐ দলের এক জানওয়ার যে কি কুকাণ্ড করেছিল, সে কথা মনে হলে এখনও পিলে চ'মকে যায়—এখনও চক্ষে জল এসে পড়ে। উঃ কি ভয়ানক !!

*   *   *

সূত্র। আপনি শুনেন নাই "জমীদার দর্পণ নাটকে" যে নক্‌সাটি এঁকেছে, তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলেছে! (পৃ. ।৶৹-।৵৹)

'জমিদার দর্পণ নাটকে'র একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি :—

রাগিণী সিন্ধু—তাল জৎ।

কুবাসনা যার মনে, তার উপাসনা কি ?

মনে এক, মুখে স্বধু হরি ব'লে ফল কি ?

মধু-মাখা-বোল মুখে, গরল রয়েছে বুকে,

হেন ছদ্ম-বেশী তার অধর্ম্মেতে ভয় কি ?

সতীর সতীত্ব ধন, হরিবারে করে পণ,

মুখে বিভু-পদে মন, এদের, অন্তঃকালে হবে কি ? (পৃ. ৬)

৪। **গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু।** (কবিতা) ইং ১৮৭৩। পৃ. ১৮।

ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (পৌষ ১২৮০) লিখিয়াছিলেন :—

গ্রন্থখানি পদ্য। পদ্য মন্দ নহে। এই গ্রন্থকার আরও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনার ন্যায়, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না।

ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়। বাঙ্গালা, হিন্দু মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান এক্ষণে পৃথক—পরস্পরের

সহিত সহৃদয়তা শূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব্ব থাকিবে, যে তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দ্দু ফারসীর চালনা করিবেন, তত দিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেন না জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা। অতএব মীর মসাঃরফ হুসেন সাহেবের বাঙ্গালা ভাষানুরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় প্রীতিকর। ভরসা করি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইবেন।

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তিকার এক খণ্ড আছে।

৫। **এর উপায় কি?** (প্রহসন) ইং ১৮৭৬।

১২৮৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বান্ধবে' সমালোচিত।

৬। **বিষাদ-সিন্ধু !!!** মহরম পর্ব্ব। ১২৯১ সাল (ইং ১৮৮৫)। পৃ. ২০৪।

উদ্ধার পর্ব্ব। ১ শ্রাবণ ১২৯৪ (ইং ১৮৮৭)। পৃ. ১৯১।

এজিদ-বধ পর্ব্ব। ১২৯৭ সাল (ইং ১৮৯১)। পৃ. ৪৩।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের "মুখবন্ধে" প্রকাশ :—

চান্দ্রমাসের বৎসরের প্রথম মাসের নাম মহরম। হিজ্‌রী ৬১ সালের ৮ই মহরম তারিখে মদিনাধিপতি হোসেন ঘটনাক্রমে সপরিবারে কারবালাভূমিতে উপস্থিত হন; এবং এজিদ্‌প্রেরিত সৈন্যহস্তে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন; সেই শোচনীয় ঘটনা মহরম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ ঘটনার মূল কি, এবং কি কারণে সেই ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বোধ হয় অনেকেই অনবগত আছেন। পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' বিরচিত

হইল। প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করিয়া প্রাচীন কবিগণের রচনাকৌশল এবং শাস্ত্রের মর্য্যাদা-রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ। মাদৃশ লোকের পক্ষে তদ্বিষয়ের যথার্থ গৌরব রক্ষার আকাঙ্ক্ষা বামনের বিধু ধরণের আকাঙ্ক্ষার ন্যায় এক প্রকার দুরাকাঙ্ক্ষা বলিতে হইবে। তবে মহরমের মূল ঘটনাটী বঙ্গভাষাপ্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রানুসারে পাপভয়ে ও সমাজের দৃঢ় বন্ধনে বাধ্য হইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' মধ্যে কতকগুলি জাতীয় শব্দ ব্যবহার করিতে হইল।...

ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে কাঙ্গাল হরিনাথের 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা' (১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) লিখিয়াছিলেন :—

গ্রন্থকর্ত্তা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া এবং গতজীবন 'আজীজন্ নাহার' সম্বাদ পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত, সুতরাং তাঁহার লেখনীর নূতন পরিচয় প্রদান বাহুল্য। প্রসিদ্ধ মহরমের আমূল বৃত্তান্ত বিষাদসিন্ধুর গর্ভ পূর্ণ হইয়া বিষাদ সিন্ধু নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। ইহার এক একটী স্থান এরূপ করুণ রসে পূর্ণ যে পাঠকালে চক্ষের জল রাখা যায় না। যাঁহারা মুসলমানদিগের মহরম পর্ব্বের বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, অনুরোধ করি, তাঁহারা বিষাদ সিন্ধু পাঠ করুন মনোরথ পূর্ণ হইবে। মুসলমানদিগের গ্রন্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ যে বঙ্গভাষা বিস্তৃতির আর একটী নূতন পথ এবং মাতৃভাষা বাঙ্গালার প্রতি মুসলমানদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে, ইহা চিন্তাশীল পাঠক সহজেই বুঝিতে পারেন...।

'ভারতী'ও (ফাল্গুন ১২৯৩) লিখিয়াছিলেন :—

ইহা মহরমের একখানি উপন্যাস ইতিহাস। ইহার বাঙ্গলা যেমন পরিষ্কার, ঘটনাগুলি যেমন পরিস্ফুট, নায়ক নায়িকার চিত্রও ইহাতে

তেমনি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটী বাঙ্গলা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

৩১ মে ১৮৮৫ তারিখে 'ষ্টেট্‌সম্যান অ্যাণ্ড ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'ও ইহার প্রশংসাসূচক সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই সমালোচনা হইতে আর একটি কথা জানা যায়:—"The author is Meer Moosharruf Hossein, an Honorary Magistrate."

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'বিষাদ-সিন্ধু'র তিন খণ্ড হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি:—

> মাবিয়া পীড়িত। তাঁহার ব্যাধি সাংঘাতিক, বাঁচিবার আশা অতি কম; এজিদের সে দিকে দৃক্‌পাত নাই, পিতার সেবাশুশ্রূষাতেও মন নাই; প্রস্ফুটিত গোলাপদলবিনিন্দিত জয়নাবের সুকোমল বদনমণ্ডলের আভা, সেই আয়তলোচনার নয়নভঙ্গীর সুদৃশ্য দৃশ্য দিবারাত্রি তাঁহার অন্তরপটে আঁকা। ভ্রূযুগলের অগ্রভাগ, যাহা সুতীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় অন্তর ভেদ করিয়া অন্তরে রহিয়াছে, দিবারাত্রি সেই বিষেই বিষম কাতর। সেই নাসিকার সরলভাবে সর্ব্বদাই আকুল। সেই ঈষৎলোহিত অধরোষ্ঠ পুনঃপুন দেখিবার আশা সততই বলবতী। আজ পর্য্যন্ত চিকুরগুচ্ছের লহরীশোভা ভুলিতে পারেন নাই। সীমান্ত অলঙ্কার, যাহা জয়নাবের কর্ণে দুলিতে দেখিয়াছিলেন, সেই দোলায় তাঁহার মস্তক আজ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত দুলিতেছে। ললাটের উপরিস্থিত মালার জালি যাহা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে চিকুরের সহিত মিলিত হইয়া কিঞ্চিৎভাগ ললাটের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল, তাঁহার মনপ্রাণ সেই জালে আট্‌কা পড়িয়া আজ পর্য্যন্তও ছট্‌ফট্ করিতেছে। সেই হাসিপূর্ণ মুখখানির হাসির আভা, যাহা জয়নাবের অজ্ঞাতে একবার দেখিয়াছিলেন, কতবার নিদ্রা গিয়াছেন,

কতশতবার চক্ষের পলক ফেলিয়াছেন, তথাচ সেই মধুর হাসির আভাটুকু আজ পর্য্যন্তও চক্ষের নিকট হইতে সরিয়া যায় নাই। সমস্তই মনে জাগিতেছে।—মহরম পর্ব্ব, পৃ. ৩০।

অশ্ব ছুটিল। হোসেনের অশ্ব বিকট চীৎকার করিতে করিতে শিমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। আবদুল্লা জেয়াদ, অলিদ, প্রভৃতি অশ্ব লক্ষ্যে অবিশ্রান্ত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সুতীক্ষ্ণ তীর অশ্ব-শরীর ভেদ করিয়া পার হইল না, কিন্তু শোণিতের ধার ছুটিল। কে বলে পশুর হৃদয়ে বেদনা নাই? কে বলে মানুষের জন্ম পশুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠে না?—মানুষের ন্যায় প্রাণ ফাটিয়া যায় না? অশ্ব ফিরিল। কিছু দূর যাইয়া শরসংযুক্ত শরীরে হোসেনের দুলদুল সিমারের পশ্চাৎ গমন হইতে ফিরিল। তীর চলিতেছে। এখন অশ্বের বক্ষে গ্রীবাদেশে, তীক্ষ্ণতর তীর ক্রমাগত বিদ্ধিতেছে; কিন্তু অশ্বের গতি, মুহূর্ত্ত জন্যে থামিতেছে না। মহাবেগে প্রভু হোসেনের শিরশূন্য দেহ সন্নিধানে আসিয়া, পদ হইতে স্কন্ধ, স্কন্ধ হইতে পদ পর্য্যন্ত নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ লইয়া, আবার মস্তক লক্ষ্যে ছুটিবার উদ্যোগ করিতেই বিপক্ষগণে নানা কৌশলে অশ্বকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হোসেনের অশ্ব সকলি দেখিতেছে, বোধ হয় অনেক বুঝিতেও পারিতেছে। ধরা পড়িলে তাহার পরিণাম-দশা কি হইবে তাহাও বোধ হয় ভাবিতেছে। প্রভু হোসেন যে পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন; সেই পৃষ্ঠে প্রভুহন্তা কাফেরগণকে লইয়া—আজীবন পাপের বোঝা বহন করিতে হইবে, একথা কি সেই প্রভুভক্ত বাক্‌শক্তি-হীন পশুর অন্তরে উদয় হইয়াছিল? সিমারের দিকে আর ছুটিল না। হোসেনের মৃত শরীর নিকটেও আর রহিল না। বাধা, কৌশল, অতিক্রম করিয়া মহাবেগে হোসেনের শিবিরাভিমুখে দৌড়িয়া চলিল। সকলেই দেখিল দুলদুলের চক্ষু, জলে পরিপূর্ণ।—উদ্ধার পর্ব্ব, পৃ. ১-২।

রাজার অভাব হইলে রাজা পাওয়া যায়, রাজ-বিপ্লব ঘটিলে তাহারও

শান্তি হয়, রাজ্যমধ্যে বিঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইলে যথাসময়ে অবশ্যই নির্ব্বাণ হয়, উপযুক্ত দাবী বুঝাইয়া দিলে সে দুর্দ্দমনীয় তেজও একেবারে বিলীন হইয়া উড়িয়া যায়। মহামারী, জলপ্লাবন ইত্যাদি দৈব-দুর্ব্বিপাকে রাজ্য ধ্বংসের উপক্রম শেষ হইলেও নিরাসসাগরে ভাসিতে হয় না—আশা থাকে। রাজার মজ্জা দোষে, কি উপযুক্ত মন্ত্রণা অভাবে রাজ্য-শাসনে অকৃতকার্য্য হইলেও আশা থাকে। মূর্খ রাজার প্রিয়পাত্র হইবার আশয়ে মন্ত্রদাতাগণ অবিচার, অত্যাচার নিবারণ উপদেশ না দিয়া অহরহঃ তোষামোদের ডালী মাথায় করিয়া প্রতি আজ্ঞা অনুমোদন করাতেই যদি রাজা প্রজার মনান্তর ঘটে, তাহাতেও আশা থাকে।—সে ক্ষেত্রেও আশা থাকে, কিন্তু স্বাধীনতা ধনে একবার বঞ্চিত হইলে সহজে সে মহামণির মুখ আর দেখা যায় না। বহু আয়াসেও আর সে রত্ন হস্তগত হয় না। স্বাধীন সূর্য্য একবার অস্তমিত হইলে পুনরুদয় হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা!

রাজা আর রাজ্য এ দুইটী পৃথক্ কথা—পৃথক্ ভাব,—পৃথক্ সম্বন্ধ। রাজা নিজ বুদ্ধি দোষে অপদস্থ হউন, সদ্‌বুদ্ধি সুমন্ত্রণায় অবহেলা করিয়া পর-পদতলে দলিত হউন, স্বেচ্ছাচারিত্ব দোষে অধঃপাতে যাউন, তাহাতে রাজ্যের কি? কার্য্য অনুরূপ ফল। পাপানুযায়ী শাস্তি। স্বেচ্ছাচারী, সুমন্ত্রণাবিদ্বেষী, নীতিবর্জ্জিত, উচিতে বিরক্ত, এমন রাজার রাজ্যপাট যত সত্বরে ধ্বংস হয়, ততই মঙ্গল। ততই রাজ্যের শনিক্ষয়। ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশা। নচেৎ রাজ্যের আর মঙ্গল নাই। বিনা কারণে, প্রেমের কুহকে, পিরীতের দায়ে, প্রণয়বাসনায়, পবিণয় ইচ্ছায়, যদি এই রাজ্য যথার্থই পরকরতলস্থ হয়, পরপদভরে দলিত হয়, আমাদের স্বাধীনতা লোপ হয়, তবে সে দুঃখের আর সীমা থাকিবে না। সে মনঃকষ্টের আর ইতি হইবে না। রাজা প্রজা-রক্ষক, বিচারক, প্রজা-পালক, এবং করগ্রাহক। কিন্তু রাজ্যের যথার্থ অধিকারী প্রজা। দায়িত্ব

প্রজারই অধিক। রাজ্য প্রজার। রক্ষার দায়িত্ব বাসিন্দা মাত্রেরই। যদি রাজ্যমধ্যে মানুষ থাকে, হৃদয়ে বল থাকে, স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান থাকে, পরাধীন শব্দের যথার্থ অর্থবোধ থাকে, জন্মভূমির মূল্যের পরিমাণবোধ থাকে, একতা বন্ধনে আস্থা থাকে, ধর্ম্মবিদ্বেষে মনে মনে পরস্পর বিরোধ না থাকে, জাতিভেদে হিংসা, ঈর্ষা, এবং ঘৃণার ছায়া না থাকে, অমূল্য সময়ের প্রতি লক্ষ্য থাকে, আলস্তে অবহেলা, এবং শৈথিল্যের বিরোধী যদি কেহ থাকে, আর চেষ্টা থাকে, বিত্তার চর্চ্চা থাকে, এবং ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে যুগযুগান্তরে হউক, শতাব্দী পরে হউক, সহস্রাধিক বর্ষ গতে হউক, কোন কালে হউক, পুনরায় অন্ধকারাচ্ছন্ন-পরাধীন-গগনে স্বাধীনতা-সূর্য্যের পুনরুদয় আশা একবার করিলেও করা যাইতে পারে।—এজিদ্-বধ পর্ব্ব, পৃ. ৩-৪।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরিতে প্রথম সংস্করণের 'বিষাদ-সিন্ধু' (১-৩ ভাগ) আছে।

৬। **গো-জীবন**। (প্রবন্ধ) ২৫ ফাল্গুন ১২৯৫ (ইং ১৮৮৯)। পৃ. ৬৬।

এই পুস্তকখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ভারতী ও বালক' (চৈত্র ১২৯৫) লিখিয়াছিলেন :—

কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই যাহাতে গোজীবন রক্ষায় সচেষ্ট হন এই অভিপ্রায়ে এই পুস্তকখানি লিখিত। গো বধের বিরুদ্ধে লেখক যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয় লেখকের হৃদয় হইতে সে সকল কথা উৎথিত, তিনি কেবল মুখের কথা মাত্র বলিতেছেন না। পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। লেখক মুসলমান হইয়া এ বিষয়ে যেরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন—যেরূপ অপক্ষপাতী ভাবে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া কেবল আনন্দ নহে

আমাদের আশ্চর্য্যও জন্মিল। ভরসা করি অন্য মুসলমানগণ তাঁহার অনুসরণ করিবেন।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ পুস্তকের প্রথম প্রস্তাব—"গো-কুল নির্ম্মূল আশঙ্কা" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভারতের অনেক স্থানে গো বধ লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। সভা সমিতি বসিতেছে, বক্তৃতার স্রোত বহিতেছে, ইংরেজী, বাঙ্গলা সংবাদ পত্রিকায় হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইতেছে, কোন কোন স্থানে হিন্দু মোসল্মান একত্রে এক প্রাণে এক যোগে গোবংশ রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কোন কোন ইংরেজী পত্রিকায় আবার প্রতিবাদও চলিতেছে। এ সময় আর নীরব থাকা উচিত মনে করিলাম না।

আমি মোসল্মান—গো জাতির পরম শত্রু। আমি গোমাংস হজম করিতে পারি, পালিয়া পুষিয়া বড় বলদটার গলায় ছুরি বসাইতে পারি, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধপায়ী গোবৎসের প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরিপোষণ করিতে পারি, কিন্তু ন্যায়চক্ষে যাহা দেখিতেছি, যুক্তি ও কারণে যাহা পাইতেছি, তাহা কোথায় ঢাকিব? স্বাভাবিক ভাব কোন্ ভাব-বশে গোপন করিব? মনে এক মুখে আর হইল না। প্রিয় মৌলবী সাহেব! মার্জ্জনা করিবেন। মুন্সী সাহেব! ক্ষমা করিবেন। সুফি সাহেব। কিছু মনে করিবেন না। কি করি, জগৎ পরাধীন—কিন্তু মন স্বাধীন। যদি কোন মোসল্মান ভ্রাতা এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া আহ্‌মদী পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

আমাদের মধ্যে "হালাল" এবং "হারাম" দুইটী কথা আছে। হালাল গ্রহণীয়, হারাম পরিত্যজ্য। এ কথাও স্বীকার্য্য যে—গোমাংস হালাল, খাইতে বাধা নাই। অশ্বমাংসও অন্য মতে (সাফি) হালাল।

আমার মতে (হানিফি) হালালও বলিতে পারি না, স্পষ্ট হারামও বলিতে পারি না। মাঝামাঝি একটা নাম আছে (মক্রুহ) আবার ঐ সাফি মতে জলজন্তু মাত্রই হালাল। দৃষ্টান্তছলে একথা বলিতে পারি যে রজকের পদ যতটুকু জলের মধ্যে বস্ত্র ধৌত সময় ডুবিয়া থাকে সাফি মতের দায় দিয়া সে মনুষ্যপদটুকুও জলমধ্য হইতে কাটিয়া লইয়া ঝল্সা, পোড়া, সিদ্ধ, সুরুয়া যাহার যেরূপ অভিরুচি হয় করিয়া উদরে ফেল, কোন চিন্তা নাই; কখনই পাপের খাতায় নাম উঠিবে না।—ইহাও শাস্ত্রের কথা। কিন্তু শাস্ত্রে একথা লিখা নাই যে গোহাড় কামড়াইতেই হইবে, গোমাংস গলাধঃ করিতেই হইবে, না করিলে নরকে পচিতে হইবে। বরং যাহা অখাদ্য,—যথা বরাহ—সে বিষয় পবিত্র কোরাণশরিফে স্পষ্টভাবে বরাহ নাম উল্লেখে "খাইও না" (হারাম) লিখা আছে। খাইলে প্রধান নরক "জাহান্নাম" তাহাতেই চিরবাস করিতে হইবে, আর নিস্তার নাই। খাদ্য সম্বন্ধে বিধি আছে যে খাওয়া যাইতে পারে, খাইতেই হইবে, গোমাংস না খাইলে মোসল্মানি থাকিবে না, মহাপাপী হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে—একথা কোথাও লিখা নাই।

খাইবার অনেক আছে। ঘোড়া খাইতে পারি,—খাই না। ফড়িং ধরিয়া ঘৃতে ভাজিয়া টপাটপ্ গিলিতে পারি—শাস্ত্রের কথা,—গিলি না। গোসাপ উদরসাৎ করিতে পারি—বিধি আছে, ভয়ে তাহার নিকটও যাই না। ছাগলের মধ্যে পাঁঠাও খাদ্য, সে পাঁঠার দিকে তত ঘেঁষি না; যে ছাগীতে দুগ্ধ দেয় তাহাকেই "আল্লাহ আক্‌বার" শুনাই। পাঁঠার সঙ্গে একেবারেই যে সম্বন্ধ নাই তাহা বলিতে পারি না। রসনা পরিতৃপ্ত আশয়ে তাহার বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতা রহিত করিয়া দিয়া দিব্বি মোটাগোটা চর্ব্বিদার জিনিস বানাইয়া, কোরমা, কালিয়া, কবাবে পেট পুরিয়া থাকি। উঁট এদেশে নাই থাকিলেও তাহার কাছে যাওয়া যাইত না। কারণ শরীরের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলী ঠাণ্ডা হয়। মহিষ খাদ্য, তাহার কাছে

ছুরি হাতে করিয়া যায় কে? কাজেই নিরীহ গো জাতির গলায় ছুরি বসাইতে আর এদিক্ ওদিক্ চাহি না। এত খাদ্য থাকিতেও কি গোমাংস না খাইলেই চলে না? ঘোড়া, মহিষ, বনগরু, মেষ, ছাগল, হাঁস, খরগোস সকলি ত চলিতে পারে? এ সকল খাইলেও ত ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়? এত থাকিতে গরুর মাংসে জিহ্বার জল পড়ে কেন? ইহার উত্তর কে দিবে?

গোদুগ্ধই আমাদের জীবন। দশ মাস মায়ের উদরে বাস করিয়া জগতের মুখ দেখিতেই যেমন ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতে থাকি, সে সময়,—হায়! অমন কঠিন সময়ে কিসে আমাদের প্রাণ রক্ষা হয়? মনে মনে একটা কথা উঠিতেছে—মায়ের ত দুগ্ধ আছে? আছে। কিন্তু গো-রস মায়ের উদরে না গেলে মায়ের স্তনে দুগ্ধ পাই কৈ? মায়ের স্তনে দুগ্ধ থাকা সত্বেও অনেকেই গো-রসে জীবন রক্ষা করিয়াছে। মিষ্টান্নে, পক্বান্নে সদ্যোজাত নবশিশুর প্রাণ রক্ষা হয় না, দুগ্ধই জীবের জীবন। জগতে দুগ্ধ ছাড়া এমন কোন একটী খাদ্য নির্দ্দিষ্ট নাই যে, সুধু সেই খাদ্যটী খাইয়া জীবন ধারণ করা যায়।

গো-রসই বঙ্গের উপাদেয় খাদ্য। সুস্থ অসুস্থ শরীরে, এমন কি প্রাণ সঞ্চার হইতে বিয়োগ পর্য্যন্ত দুগ্ধের প্রয়োজন। সেই দুগ্ধের মূল গোধনকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিলে আর কি রক্ষা আছে !!...

আর একটি কথা। এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মোসল্মান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্ম্মে এবং কর্ম্মে এক—সংসারকার্য্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন, উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি?

ধর্ম্মে আঘাত লাগে না, গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ধরকন্নারও

ব্যাঘাত জন্মে না। উন্নতির পথেও কাঁটা পড়ে না। প্রাণের হানিও বোধ হয়—হয় না। এ অবস্থায় গো হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চিরসহযোগী ভ্রাতার মনরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, আর যাহা রক্ষা, তাহা বার বার বলিব না। যাহাতে সকল দিক্ রক্ষা হয় সে ত্যাগে ক্ষতি কি? (পৃ. ১-৪, ৬-৭)

৭। বেহুলা গীতাভিনয়। ৭ আশ্বিন ১২৯৬ (ইং ১৮৮৯)। পৃ. ১৩৮।

বেহুলা গীতাভিনয়। / মীর মশার্‌রফ হোসেন। / প্রণীত। / টাঙ্গাইল। / আহ্‌মদী যন্ত্রে। / শ্রীসাধু সরকার দ্বারা / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ১২৯৬ শাল ৭ই আশ্বিন। / মূল্য ৷৷০ আনা। /

ইহা হইতে "অগ্রে পাঠ্য" অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

বেহুলা নখিন্দরের কথা নূতন নহে। বঙ্গের স্ত্রী মহলে বেহুলার কাহিনী—বড়ই আদরের। কথাটা যে একেবারেই উপকথা—এরূপ বোধ হয় না। ভাগলপুর অঞ্চলে চাম্পাই নগর, সাতালী পর্ব্বতের চিহ্ন—এবং ত্রিবেণীর নিকট নেতা ধোপানীর পাট (এই ক্ষণে পাথরে পরিণত) আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ঘটনা লইয়াই যশোহর অঞ্চলে প্রথম ভাসান যাত্রার সৃষ্টি হয়। ভাসানের ভাষা দোষে, রচয়িতার অযথা বর্ণনায়, এবং পরিশুদ্ধ সঙ্গীতের অভাব হেতুতেই শিক্ষিত সমাজে ভাসান যাত্রার আদর নাই। কিন্তু শুক্তিতেই মুক্তা, স্বর্ণকারের নিক্ষিপ্ত অঙ্গারভস্মেই সুবর্ণকণা, সামান্য প্রস্তরেই কোহিনূর, এবং দারইয়াই নূরের জন্ম। এই পরিসিদ্ধ বাক্যের অনুকরণে—দৃষ্টান্ত স্থলে বলিতে পারি মনসার ভাসানই "বেহুলা গীতাভিনয়"। এই গীতাভিনয়ে শিক্ষিত-সমাজের কথঞ্চিৎ পরিমাণ চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিলেই, আমার শ্রম

সার্থক বিবেচনা করিব।...১২৯৬—৭ই আশ্বিন। মীর মশাররফ হোসেন শান্তিকুঞ্জ,—টাঙ্গাইল।

এই পুস্তকের এক খণ্ড বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরিতে আছে।

৮। **উদাসীন পথিকের মনের কথা।** (উপন্যাস) ইং ১৮৯১। পৃ. ১৯৮।

গ্রন্থকার "মুখবন্ধে" যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> গুপ্ত কথা, গুপ্ত লিপি, গুপ্ত কাণ্ড, গুপ্ত রহস্য, গুপ্ত প্রেম, ক্রমে সকলই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মনের কথা মনেই রহিয়াছে। মনের কথা অকপটে মুখে প্রকাশ করা বড়ই কঠিন। বিশেষ সংসারীর পক্ষে নানা বিঘ্ন, নানা ভয়, এমন কি, জীবনে সংশয়। সংসারে আমার স্থায়ী বসতিস্থান নাই। সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, বুদ্ধি নাই। আপন বলিতে কেহই নাই। সত্য কথা বলিতে দোষ কি ?...
>
> এই অসার, অপরিচিত, অস্থায়ী "আমি", আমার ভাবনা চিন্তার কোনই কারণ নাই। সুতরাং মনের কথা অকপটে প্রকাশ করিতে বোধ হয় পারিব। সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন, আর মা—জানেন। কারণ শোনা কথাই পথিকের মনের কথা।...উদাসীন পথিক।

এই পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ভারতী' (বৈশাখ ১২৯৮) লিখিয়াছিলেন :—

> সমালোচ্য পুস্তক-খানি ঠিক উপন্যাস নহে, ইহা উপন্যাসাকারে নীল অত্যাচারের কাহিনী পূর্ণ। অত্যাচারের বিবরণ বেশ হইয়াছে—তবে গল্পের ভাগ তেমন পরিপাটী হয় নাই।

ইহার আখ্যাপত্রহীন একখণ্ড বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরিতে আছে।

১০। **গাজী মিয়ঁার বস্তানী**, প্রথম অংশ। (উপন্যাস) আশ্বিন ১৩০৬। পৃ. ৪০০।

আখ্যা-পত্রে লেখকের নাম নাই। কেবল দেওয়া আছে—"সত্ত্বাধিকারী উদাসীন পথিক।"

১৩০৮ সালের পৌষ সংখ্যা 'প্রদীপে' অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই পুস্তকের যে দীর্ঘ সমালোচনা করেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> গাজী মিয়ঁার বস্তানী একখানি বিচিত্র, সমাজচিত্র সুশোভিত সুলিখিত উপন্যাস। ইহাতে নাই, এমন রস দুর্ল্লভ! কটু, তিক্ত, কষায়,—অম্ল, অম্লমধুর,—মধুর, অতি মধুর,—যাহা চাও, তাহাই প্রচুর। অথচ সকল রসের উপর দিয়া কাতর করুণরস উছলিয়া পড়িতেছে।
>
> গ্রন্থকার স্পষ্টবাদী হইলে শ্রুতিকটুদোষ পরিহার করিতে পারেন না; স্পষ্ট কথা সত্য হইতে পারে, সকল স্থলে সুমিষ্ট হয় না। সুতরাং গাজী মিয়ঁার কথা স্থানে স্থানে বড়ই কড়া হইয়াছে। তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে কশা ধারণ করিয়া যেখানে যাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছেন, সেখানেই যেন সপাসপ্ আঘাতধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছে, কাতরক্রন্দনের সঙ্গে রক্তধারা ছুটিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। সে আঘাত কাহার পৃষ্ঠে বা পতিত হয় নাই? পাঠক! হয়ত তুমি আমি আর তাহারা কেহই বাদ যাই নাই।..
>
> মফঃস্বলের কথা মফঃস্বলের ভাষায় লিখিতে গিয়া গাজী মিয়ঁা প্রসঙ্গক্রমে আবশ্যক অনাবশ্যক অনেক প্রকারের পল্লীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; তন্মধ্যে মফঃস্বলবাসী ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকেরই ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন মনে হয়, বুঝি তোমাকে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে! কেবল পাত্রগণের

নাম জয়ঢাক, ধিন্‌তাধিনা, জেনাচেয়া, দাগাদারী, ভূড়ুক পাহাড় ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া যাহা কিছু রক্ষা! বস্তানীর পল্লী-চিত্র ইংরাজরাজ্যের লজ্জার বিষয়; পড়িতে পড়িতে মনে হয় ইংরাজরাজ্যের বাহিরে বিলাতি বার্ণিস, ভিতরে টিনের পাতা; দেখিতে খুব জমকাল। আইন আছে, আদালত আছে। আপীলের উপর আপীল আছে, কিন্তু বিচার নাই! ছোট লোকের সঙ্গে ছোট লোকের মোকদ্দমায় সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটে না; কিন্তু ছোট বড় ধনী দরিদ্র কলহে লিপ্ত হইলে দরিদ্রের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। বিচার প্রণালীর দোষে বহুব্যয় করিয়া মুক্তিলাভ করিতে দরিদ্রের প্রাণান্ত ঘটিয়া থাকে, কখন বা এত করিয়াও সুবিচার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দোষ ইংরাজের নহে, দেশীয় কর্ম্মচারীর; গাজী মিয়াঁ সেই কথা বুঝাইবার জন্য নানা কথার অবতারণা করিয়াছেন।··· রাজা প্রজা সকলের পক্ষেই এরূপ গ্রন্থ সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ!

গাজী মিয়াঁ কে? কে এই কল্পিত নামের অন্তরালে থাকিয়া এরূপ সুতীব্র সমালোচনায় রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খের কার্য্য-কলাপের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন? পুস্তক পড়িয়া এই কথা মনে হইবামাত্র দেখিলাম গাজী মিয়াঁর আত্মগোপনচেষ্টা সফল হয় নাই। পুস্তকের সর্ব্বত্র তাঁহার পরিচয় পরিস্ফুট। তিনি একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্বদেশভক্ত অনুরক্ত মুসলমান সাহিত্য-সেবক।* মুসলমান সাহিত্য-সেবকের সংখ্যা অল্প, তন্মধ্যে "বিষাদ-সিন্ধু রচয়িতা" শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেন ভাই সাহেব বাঙ্গলা গদ্য রচনার জন্য সুপরিচিত। যে লেখনী

* অন্যত্র মশার্‌রফ হোসেন-সম্পাদিত 'আজিজন্ নেহার' পত্রিকার উল্লেখ আছে। এই নামের একখানি পত্রিকা ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ তারিখের 'সাধারণী' পত্রে এই "নূতন পত্রিকা" প্রকাশের সংবাদ আছে। "হুগলি কালেজের মুসলমান ছাত্রগণ ইহা প্রকাশ করিতেছেন।" সম্ভবতঃ মশার্‌রফ হোসেন এই পত্রিকারই সম্পাদক ছিলেন।

হইতে 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রসূত হইয়াছে, 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'ও যে 'সেই লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না। এমন ভাষা, এমন ভাব, এমন কাহিনীবিন্যাস-কৌশল মুসলমান সাহিত্য-সেবকদিগের মধ্যে এ পর্য্যন্তও কেবল "বিষাদ-সিন্ধুর রচয়িতাতেই" লক্ষিত হইয়াছে। (পৃ. ৩৯-৪০)

কলিকাতার চৈতন্য লাইব্রেরিতে এক খণ্ড "গাজী মিয়াঁর বস্তানী" আছে।

১১। **সঙ্গীত-লহরী।**

১২। **মৌলুদ শরীফ।** (গদ্য-পদ্য)

১৩। **মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা।** ১ম ভাগ। ১ অক্টোবর ১৯০৩। ২য় ভাগ। ১৫ মে ১৯০৮। পৃ. ৫৩।

১৪। **বিবি খোদেজার বিবাহ।** (কবিতা) ২৫ মে ১৯০৫। পৃ. ১২৭।

১৫। **হজরত ওমরের ধর্ম্ম-জীবন লাভ।** (কবিতা) ১ শ্রাবণ ১৩১২ [১১ আগষ্ট ১৯০৫] পৃ. ৪২।

১৬। **হজরত বেলালের জীবনী।** ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৫। পৃ. ৪২।

১৭। **হজরত আমীর হামজার ধর্ম্ম-জীবন লাভ।** ১০ নবেম্বর ১৯০৫। পৃ. ২২।

১৮। **মদিনার গৌরব।** (কবিতা) ১৫ ডিসেম্বর ১৯০৬। পৃ. ১২০।

১৯। **মোস্লেম-বীরত্ব।** (কবিতা) ২০ জুলাই ১৯০৭। পৃ. ১৯৬।

২০। **এস্‌লামের জয়।** ৪ আগস্ট ১৯০৮। পৃ. ৩০৭।

২১। **আমার জীবনী।** (আত্মজীবনী) ইং ১৯০৮-১০।

ইহা ১২টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৮ তারিখে এবং শেষ বা ১১শ-১২শ খণ্ড ২ মার্চ ১৯১০ তারিখে প্রকাশিত হয়।

এই ১২টি খণ্ড একত্রে বাঁধাইয়া [পৃ. ৪১৫) বিক্রয়ার্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার এক খণ্ড শ্রীযুক্ত এস. এ. জাফর আমাকে দেখাইয়াছেন।

ইহাতে লেখক তাঁহার প্রথম বিবাহ পর্য্যন্ত ঘটনা চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই জীবনীর প্রত্যেক খণ্ডের শেষে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র শেষ অংশ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। কারণ, "আমার জীবনীর সহিত গাজী মিয়াঁর বস্তানীর শেষ অংশে বিশেষ সংস্রব আছে।"

২২। **বাজীমাৎ।** (কবিতা) ডিসেম্বর ১৯০৮। পৃ. ১৩১।

২৩। **হজরত ইউসোফ।**

'আমার জীবনী'র ১ম খণ্ডে (আশ্বিন ১৩১৫) ইহা "যন্ত্রস্থ" এই সংবাদ আছে।

২৪। **খোত্‌বা।**

২৫। **বিবি কুলসুম।** চৈত্র ১৩১৬ [৯ মে ১৯১০] পৃ. ১৬৭।

গ্রন্থকারের সহধর্ম্মিণী বিবি কুলসুমের (মৃত্যু ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১৬) জীবনী। এই পুস্তকে প্রকাশ :—

...টাঙ্গাইল আমার কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে কুলসুম বিবির কথা কার্য্য বিবরণ যাহা ১৩০৬ সালে গাজী মিয়াঁর বস্তানী মধ্যে প্রকাশ হইয়াছে তাহাই প্রকাশ করিব। ১৩০৬ সালে প্রকাশ হইয়াছে সত্য, বস্তানী ছাপাখানার প্রায় ৫ বৎসর পড়িয়াছিল, নানা কারণে নিয়মিত সময়ে প্রকাশ হয় নাই।...কাপি প্রস্তুত হইয়া ছয় বৎসর পর ছাপা শেষ হয়। ...একটী গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। গাজী মিয়াঁর বস্তানীতে গাজী মিয়াঁ আমাকে "ভেড়াকান্ত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গাজী মিয়াঁর চক্ষে আমি "ভেড়াকান্ত" বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছি। বিবি কুলসুম "বউ" আখ্যায় সম্বোধিতা ও পরিচিতা হইয়াছেন। পাঠকগণ স্থির করিয়া লইবেন ভেড়াকান্ত আমি, আর 'বউ' কুলসুম বিবি। (পৃ. ৬৯-৭১)

ডাঃ আব্দুল্ গফুর সিদ্দিকী এক খণ্ড 'বিবি কুলসুম' আমাকে দেখাইয়াছেন।

মৃত্যু

১৩১৮ সালের শেষ ভাগে মীর মশার্‌রফ হোসেন পরলোক-গমন করেন। ঐ বৎসর ১৯এ ফাল্গুন চুঁচুড়ায় পঞ্চম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার অভিভাষণে মীর মশার্‌রফ হোসেন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

বাণীর বিহারক্ষেত্রে আমাদের জাতিভেদ, জ্ঞাতিভেদ কিছুই নাই। ...মায়ের যেমন জাতিবিচার নাই, আমরাও সেইরূপ আজি যেমন

মনোমোহন বসু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্য বিলাপ করিতেছি, মীর মোসারেফ্ হোসেনের জন্য সেইরূপ গভীর দুঃখে আত্মহারা হইয়াছি। আমার বড় বাসনা হইয়াছিল, মনোমোহন বা গিরিশচন্দ্রের অন্যতর একজনকে এই সম্মিলনের সভাপতি করা হয়;—আমি এমন কি এইরূপ প্রস্তাবও করিয়াছিলাম। বুঝিয়াছি কাল আমার বিরোধী ছিল। মীর মোসারেফ্ হোসেনকে আমি কখন দেখি নাই; তাঁহার "বিষাদসিন্ধু" আমাকে বিচলিত করিয়াছিল। বড় আশা করিয়াছিলাম এই সম্মিলনে তাঁহাকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন করিব। শেষ সময়ে শুনিলাম, তিনি এখন বিহেস্তবিহারী। যাঁহারা কখন মুর্শিদাবাদের মহরমের সময় মর্শিয়াগীতি শুনিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন মহরমের আখ্যান-কাব্য "বিষাদসিন্ধু" কিরূপ প্লাবনী করুণারসে টল টল করিতেছে। আর সেই সিন্ধুর ভাষা বাঙ্গালি হিন্দু লিখিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিবে।—'বসুধা', ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩১৮, পৃ: ৩৮৬-৮৭।

মীর মশার্‌রফ হোসেন দীর্ঘকাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ তারিখে পরিষদ্-মন্দিরে তাঁহার একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।
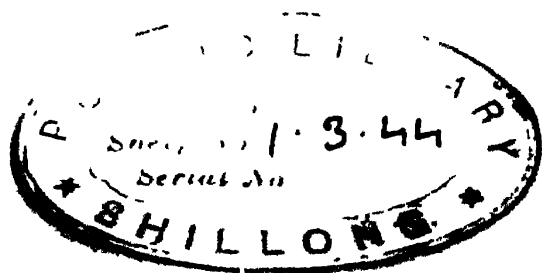
সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৮

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৮২০—১৮৯১
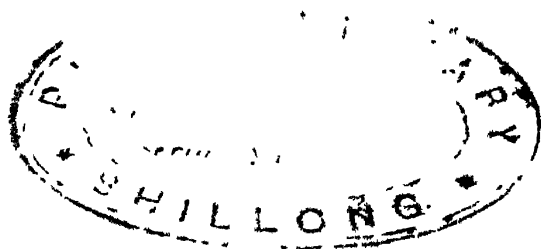
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০)। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বংশগত প্রথামত তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রথমে সংস্কৃত-সাহিত্য শিখাইতে মনস্থ করেন। নয় বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়।

ছাত্রজীবন

ঈশ্বরচন্দ্র দ্বাদশ বৎসর পাঁচ মাস সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্রের সাহায্যে তাঁহার ছাত্রজীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখিত হইল।

ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণী

ঈশ্বরচন্দ্র প্রথমে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন (১ জুন ১৮২৯)। এই সময়ে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপনা করিতেন কুমারহট্টনিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের কথা ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

> ১৮২৯ খৃষ্টীয় শাকে, জুন মাসের প্রথম দিবসে, আমি কলিকাতায় রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থিরূপে পরিগৃহীত হই। তৎকালে আমার বয়স নয় বৎসর। ইহার পূর্ব্বে আমার সংস্কৃতশিক্ষার আরম্ভ হয় নাই। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া, ঐ শ্রেণীতে তিন বৎসর ছয় মাস অধ্যয়ন করি।…

> কুমারহট্টনিবাসী পূজ্যপাদ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়, অপর দুই শ্রেণীর ছাত্রেরা কোনও ক্রমে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদানকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্নবান্‌, ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী বলিয়া অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। —'শ্লোকমঞ্জরী', বিজ্ঞাপন।

ব্যাকরণ-শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার দেড় বৎসর পরে (অর্থাৎ, ১৮৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষার পর) ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক ৫৲ করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিতে' ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র "কলেজে প্রবিষ্ট হইবার ছয় মাস পরে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া, মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি পাইলেন।" কৃতী ছাত্রদিগকে কলিকাতায় বাসা-খরচের জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হইত। যাহারা বৃত্তি পাইত তাহাদিগকে "Pay Student," এবং যাহারা বৃত্তি পাইত না তাহাদিগকে "Out Student" বলা হইত। এই সময় ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন—মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি।

ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে সাড়ে তিন বৎসর—১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন:—

> প্রথম তিন বৎসরে মুগ্ধবোধপাঠ সমাপ্ত করিয়া, শেষ ছয় মাসে অমরকোষের মনুষ্যবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলাম।—'শ্লোকমঞ্জরী', বিজ্ঞাপন।

ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র উপর্যুপরি তিনটি বার্ষিক পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করায় তিন বার পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। পারিতোষিকের পরিমাণ এইরূপ :—

১৮৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় "আউট ষ্টুডেন্ট"রূপে ব্যাকরণ ও নগদ ৮৲।

১৮৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায়—অমরকোষ, উত্তররামচরিত ও মুদ্রারাক্ষস।

১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় "পে ষ্টুডেন্ট"রূপে নগদ ২৲। মদনমোহন তর্কালঙ্কার পাঁচ টাকা মূল্যের পুস্তক পাইয়াছিলেন।

ইংরেজী-শ্রেণী

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা দিবার জন্য ১ মে ১৮২৭ তারিখে ওলাস্টন (M. W. Wollaston) নামে এক জন সাহেবকে মাসিক ২০০৲ বেতনে নিযুক্ত করা হয়। ইহা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় ছিল না। ব্যাকরণ-শ্রেণী হইতেই প্রথমে ইংরেজী-শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে হইত। ব্যাকরণ-শ্রেণীতে মুগ্ধবোধ পড়িতে পড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী-শ্রেণীতেও যোগ দিয়াছিলেন (ইং ১৮৩০)।

১৮৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজী ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররূপে ঈশ্বরচন্দ্র ৫।০ মূল্যের পুস্তক—*History of Greece* (Rs. 4), Reader etc. (Re. 1-8-0), এবং ১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্ররূপে Poetical Reader No. 3 এবং English Reader No. 2 পারিতোষিক-স্বরূপ পাইয়াছিলেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ হইতে ইংরেজী-শ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাহিত্য-শ্রেণী

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার এই শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত দুই বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য-শ্রেণীতে ছিলেন। এই দুই বৎসরও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় মাসিক ৫৲ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। সাহিত্য-শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্রকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, বেণীসংহার, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, উত্তররামচরিত, দশকুমারচরিত, কাদম্বরী পড়িতে হইয়াছিল।

১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় (অর্থাৎ সাহিত্য-শ্রেণীর দ্বিতীয় বৎসরের পরীক্ষায়) প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র 'সাহিত্যদর্পণ', 'কাব্যপ্রকাশ' ও দুই খণ্ড *History of British India* পারিতোষিক-স্বরূপ পান। মদনমোহনও অনুরূপ পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। দেবনাগর হস্তাক্ষরের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র একটি স্বতন্ত্র পারিতোষিক—হিতোপদেশ ও রবিন্সনের *Grammar of History* পাইয়াছিলেন।

অলঙ্কার-শ্রেণী

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। এই শ্রেণীতে তখন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ অধ্যাপনা করিতেন।

অলঙ্কার-শ্রেণীতেও মদনমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন এবং উভয়েই মাসিক ৫৲ বৃত্তি পাইতেন। এই শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তাঁহাকে 'সাহিত্যদর্পণ,' 'কাব্যপ্রকাশ' ও

'রসগঙ্গাধর' পড়িতে হইয়াছিল। ১৮৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্য-প্রকাশ, রত্নাবলী, মালতীমাধব, উত্তররামচরিত, মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোর্ব্বশী ও মৃচ্ছকটিক পারিতোষিক পাইয়াছিলেন।

বেদান্ত-শ্রেণী

অলঙ্কার-শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সহপাঠী মদনমোহনের সহিত ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্ত-শ্রেণীতে যোগদান করেন। শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি এই শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত দুই বৎসর কাল ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্ত-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এত দিন তিনি মাসিক ৫৲ বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে তাঁহার ও মদনমোহনের মাসিক বৃত্তি ৮৲ নির্দ্ধারিত হয়।

১৮৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষার পারিতোষিকের তালিকা সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রের মধ্যে পাই নাই। এই কারণে এ-বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র কোন পারিতোষিক পাইয়াছিলেন কি না, জানা যায় নাই। বেদান্ত-শ্রেণীতে দ্বিতীয় বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর, ১৮৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দশ টাকা মূল্যের পুস্তক—মনু (২৲), প্রবোধচন্দ্রোদয় (২৲), অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব (৫৲) এবং দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্তকমীমাংসা (১৲) পারিতোষিক-স্বরূপ পাইয়াছিলেন। মদনমোহনও অনুরূপ পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। ১৫ মে ১৮৩৮ তারিখে টাউন-হলে এই পুরস্কার বিতরিত হয়।

স্মৃতি-শ্রেণী

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই শ্রেণীতে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। হরনাথ তর্কভূষণ তখন স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি-শ্রেণীতে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ববৎ মাসিক ৮৲ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই শ্রেণীতে তাঁহাকে মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা, দায়তত্ত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ ও ব্যবহারতত্ত্ব পড়িতে হইয়াছিল। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন, হরচন্দ্র "তর্কভূষণ মহাশয়, দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বটে; কিন্তু প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার তৎপূর্ব্বে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না; সুতরাং স্মৃতির ব্যবহারাধ্যায়ে ভালরূপ ব্যবস্থা স্থির করিতে অক্ষম ছিলেন। যদিও অগ্রজ স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি ঐ পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়া মনের তৃপ্তি জন্মাইত না; একারণ, অদ্বিতীয় ধীশক্তি-সম্পন্ন হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট যাইয়া স্মৃতি অধ্যয়ন করিতেন।"

১৮৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র নগদ ৮০৲ পারিতোষিক পাইয়াছিলেন; তাঁহার সহাধ্যায়ী মুক্তারাম পাইয়াছিলেন ১০০৲। কিন্তু সংস্কৃত গদ্য-রচনার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি-শ্রেণীর আর একটি পারিতোষিক ১০০৲ পাইয়াছিলেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত গদ্য রচনাটি ঈশ্বরচন্দ্রের 'সংস্কৃত রচনা' পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু সেটির সহিত আসল রচনাটির বিশেষ মিল নাই। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন দপ্তর হইতে আসল রচনাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

লৌকিককার্য্যে সত্যকথনস্তোপকারাঃ ।

সত্যং হি নাম মানবস্ত সাধারণজনবিশ্বসনীয়তাপ্রতিপাদকং বিশ্বসনীয়তায়াশ্চ ফলমিহ বহুতরমুপলভ্যতে তথাহি যদি কস্তচিৎ কথঞ্চন সত্যকথনদর্শনেন সাধারণসমীপে বিশ্বসনীয়তা ভবতি ভবতি হি তস্ত ক্রমশো নরপতিবিশ্বাসভাজনতা সমুদ্ভূতায়াঞ্চ তস্তাং কিং নাম নরস্ত দুরবাপমবতিষ্ঠতে অর্থিপ্রত্যর্থিনোশ্চ বিবদমানয়োঃ সন্দিগ্ধবিষয়ে সন্দেহাপারপারাবারবারিণি নিমগ্নস্ত নরপতের্ন তন্নিস্তরণবিষয়ে সাক্ষিণাং সত্যবচনতরণিরূপাবলম্বনমন্তরেণ কশ্চন সদুপায়ঃ সাক্ষিণামপি সত্যকথনেন বহুতরপ্রতিষ্ঠা দৃশ্যতে যস্ত পুনর্বচসি ন সত্যতাপ্রতিভাসঃ কো নাম তমিহ বিশ্বসিতি তথাপি যদি কথঞ্চন সাক্ষিণাং বচনস্তাসত্যতাবিজ্ঞানং ভবতি তে খলু ভবন্তি চিরমেব সাক্ষিধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ সত্যতাবিশ্বসনীয়া অনেকশো দণ্ডনীয়াশ্চ অপিচ কিমত্র বহুতরং বক্তব্যং শিশবোঽপি বাললীলাবিষয়ে যদি কশ্চিন্মিথ্যাবাদিতয়া নিশ্চিতো ভবতি শৃণুত ভোঃ সখায়ো নানেনাধমেনাস্মাভিঃ পুনর্ব্যবহর্ত্তব্যমযং খলু মৃষাভাষীত্যেবমাদি গিরমুদ্গিরন্তীতি লৌকিককার্য্যে বহুধা সত্যকথনস্তোপকার ইত্যত্র কিং বিস্তরেণেতি ।

ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যায়ি
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ ।

হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা

সংস্কৃত কলেজে রীতিমত স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিলেন। সেকালে যাঁহারা আদালতের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদিগকে এই পরীক্ষা দিতে হইত। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল তারিখে এই পরীক্ষা হয়। কৃতিত্বের সহিত

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরবর্ত্তী মে মাসে ঈশ্বরচন্দ্র যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

HINDOO LAW COMMITTEE OF EXAMINATION.

We hereby certify that at an Examination held at the Presidency of Fort William on the 22nd twenty-second April 1839 by the Committee appointed under the provisions of Regulation XI 1826 Issur Chunder Vidyasagur was found and declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindoo Law to hold the office of Hindoo Law Officer in any of the Established Courts of Judicature.

H. T. PRINSEP President
J. W. J. OUSELY Members of the Committe of Examination.

This Certificate has been granted to the said Issur Chunder Vidyasagur under the Seal of the Committee this 16th Sixteenth day of May in the year 1839 corresponding with the 3rd Third Joistha 1761 Shukavda.

J. C. C. Sutherland
Secy. to the Committee.

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রদত্ত এই প্রশংসাপত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের নামের শেষে "বিদ্যাসাগর" উপাধিটি লক্ষণীয়। অনেকে লিখিয়াছেন, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের পাঠ সমাপন করিলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ মিলিত হইয়া তাঁহাকে "বিদ্যাসাগর" উপাধি দিয়াছিলেন। এরূপ উক্তি যে ভিত্তিহীন, তাহা জানা যাইতেছে।

ন্যায়-শ্রেণী

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। নিমাইচন্দ্র শিরোমণি তখন এই শ্রেণীর অধ্যাপক।

এই বৎসর (১৮৩৯) ২১ মে তারিখে সকল বিভাগের বহু ছাত্র সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী-বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত সেক্রেটরী জি. টি. মার্শেলের নিকট আবেদন করেন। আবেদনপত্রে স্থায়-শ্রেণীর ছাত্র-বর্গের নামের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রেরও নাম আছে। আবেদনকারীরা লিখিয়াছিলেন :—

ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়িনাং ছাত্রাণাং

…আমারদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল সংস্কৃত পাঠশালাতেই ইংরাজিভাষাধ্যয়নের রীতি উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু মাদর্শাতে উক্তভাষাধ্যয়ন ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে কেবল আমারদিগেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবেক নতুবা যে রাজা এতদ্দেশে ইংরাজি বিত্তাবৃদ্ধ্যর্থে যত্নপূর্ব্বক বহুতর ধন ব্যয় করিয়া বিত্তালয় সংস্থাপন করিতেছেন তাঁহার যে কেবল এতন্মহানগরস্থ প্রধান বিত্তালয়ের ছাত্রদিগের উক্তভাষাভ্যাসবিষয়ে অমনোযোগ হইয়াছে ইহা কোনরূপেই সম্ভব নহে অতএব•এইক্ষণে প্রার্থনা যে অনুগ্রহপূর্ব্বক রীত্যনুসারে আমারদিগের ইংরাজিভাষাভ্যাসের অনুমতি প্রকাশ হয় তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কার্য্য ও শিল্লাদি বিত্তা জানিয়া লৌকিক কার্য্য নির্বাহে সমর্থ হইতে পারি ইতি—লিপিরিয়ং জ্যৈষ্ঠস্তাষ্টদিবসীয়া—

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়-শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র একটি রচনা-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'সংস্কৃত রচনা' পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

পশ্চিম অঞ্চলে, [সাহারাণপুরের] জন মিয়র নামে, এক অতি মহানুভাব সিবিলিয়ান্ ছিলেন। ঐ মাননীয় বিদ্যোৎসাহী মহোদয়ের প্রস্তাব অনুসারে, পুরাণ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ও য়ুরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে, কতকগুলি শ্লোক লিখিয়া, একশত টাকা পারিতোষিক পাইয়াছিলাম। (পৃ. ১৬)

এই সকল শ্লোক বিদ্যাসাগর-রচিত 'ভূগোলখগোলবর্ণনম্' পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু এই পুরস্কারের পরিমাণ ছিল ৫০৲—এক শত টাকা নহে।

সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রের মধ্যে ১৮৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে বার্ষিক পরীক্ষার পারিতোষিকের কোন তালিকা পাই নাই, এই কারণে স্মায়-শ্রেণীর ছাত্ররূপে ঈশ্বরচন্দ্র কোন্ কোন্ বিষয়ে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারি নাই। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন, তিনি "দর্শনের প্রাইজ ১০০৲ টাকা পান, এবং সংস্কৃত কবিতা-রচনায় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কবিতা লিখিয়া ১০০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন।" "বিদ্যার প্রশংসা" নামে সংস্কৃতে একটি পদ্য রচনা করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিযোগিতায় এক শত টাকা পাইয়াছিলেন—এ কথা তিনি নিজেই 'সংস্কৃত রচনা' পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখে নিমাইচন্দ্র শিরোমণির মৃত্যু হইলে সর্ব্বানন্দ স্মায়বাগীশ কিছু দিন অস্থায়ী ভাবে স্মায়শাস্ত্রাধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১১ আগস্ট ১৮৪০ তারিখে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মাসিক ৮০৲ বেতনে স্থায়ী ভাবে স্মায়-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্র স্মায়-শ্রেণীতে দ্বিতীয় বৎসর (ইং ১৮৪০-৪১) প্রধানতঃ জয়নারায়ণেরই নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। স্মায়-শ্রেণীতে তাঁহাকে ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, স্মায়সূত্র ও কুসুমাঞ্জলি পড়িতে হইয়াছিল।

১৮৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে স্মায়-শ্রেণীর দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র একাধিক বিষয়ে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন; স্মায়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১০০৲, পদ্যরচনার জন্ম ১০০৲, দেবনাগর-হস্তাক্ষরের জন্ম ৮৲, এবং বাংলায় কোম্পানীর রেগুলেশন বিষয়ে

পরীক্ষায় ২৫৲—সর্ব্বসাকল্যে নগদ ২৩৩৲। তাঁহার পদ্যরচনার বিষয় ছিল—অগ্নীধ্র রাজার তপস্যা; ইহা তাঁহার 'সংস্কৃত রচনা' পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দেও বিদ্যাসাগর কয়েক মাস জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের অধীনে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মাসিক বৃত্তি ৮৲ ঐ বৎসরের জুন মাসে বন্ধ হইয়া যাইবার উল্লেখ ২৪ এপ্রিল ১৮৪০ তারিখে প্রস্তুত ছাত্রদের বৃত্তির একটি তালিকায় পাইয়াছি। বিদ্যাসাগর অনধিক তিন বৎসর সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন।

জ্যোতিষ-শ্রেণী

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্থির হয়, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য ও অলঙ্কার-শ্রেণীর ছাত্রগণকে অন্ততঃ এক বৎসর ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী ও বীজগণিত পড়িতে হইবে। এই বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য পরবর্ত্তী মে মাসে, উইল্‌সন সাহেবের সুপারিশে, যোগধ্যান মিশ্র নামে এক জন পণ্ডিত মাসিক ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। আমার মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়-শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে জ্যোতিষ-শ্রেণীর পাঠও লইয়া থাকিবেন। তিনি যে এক সময় এই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ তাঁহাকে যে প্রশংসাপত্র দেন, তাহাতে জ্যোতিষের অধ্যাপক যোগধ্যান মিশ্রেরও স্বাক্ষর আছে।

প্রশংসাপত্র

বারো বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে বিদ্যাসাগর কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্র লাভ

করেন। ইহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই; কৌতূহলী পাঠক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' পুস্তকে তাহার প্রতিলিপি দেখিতে পাইবেন।

৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গও মিলিত হইয়া বিদ্যাসাগরকে দেবনাগর অক্ষরে লেখা একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ :—

অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুত কোম্পানিসংস্থাপিতবিদ্যামন্দিরে ১২ দ্বাদশ বৎসরান্ ৫ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিতশাস্ত্রাণ্যধীতবান্।

ব্যাকরণম্	...	শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মভিঃ
কাব্যশাস্ত্রম্	...	শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মভিঃ
অলঙ্কারশাস্ত্রম্	...	শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
বেদান্তশাস্ত্রম্	...	শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
ন্যায়শাস্ত্রম্	...	শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রম্	...	শ্রীযোগধ্যানশর্ম্মভিঃ
ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ	...	শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ

সুশীলতয়োপস্থিতস্তৈস্তৈস্তেষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট।
১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমার্গশীর্ষস্য বিংশতিদিবসীয়ম্।

Rassomoy Dutt, Secretary.
10 Decr. 1841.

ইহাই সংক্ষেপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্রজীবনের ইতিহাস,—নীরস ইতিহাস সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি বাংলা ভাষাকে সর্ব্বপ্রথমে সরস করিয়া সাহিত্যের মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনের উদ্যোগপর্ব্বের ইতিহাস ঐতিহাসিকের নিকট কম মূল্যবান হইবার কথা নয়।

চাকুরী-জীবন

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার

কলিকাতা গবর্ণেণ্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহির হইয়া সৌভাগ্যক্রমে অল্প দিনের মধ্যেই এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের চাকুরী জুটিল। ৯ নবেম্বর ১৮৪১ তারিখে মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদারের পদ শূন্য হয়। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পদের প্রার্থী হইলেন। বিলাত হইতে যে-সকল সিবিলিয়ান এদেশে চাকুরী করিতে আসিতেন, তাঁহাদিগকে প্রথমে কলিকাতায় থাকিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি দেশীয় ভাষা শিখিতে হইত, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন জেলার শাসনকার্য্যের ভার পাইতেন। তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী ছিলেন ক্যাপ্টেন জি. টি. মার্শেল; গবর্ণেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের বৃত্তি-পরীক্ষায় পরীক্ষক থাকিতেন, তাহা ছাড়া কিছু দিন ঐ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটরীও ছিলেন। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্র-জীবনের কৃতিত্বের সহিত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পরিচয় ছিল। মার্শেল ঈশ্বরচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বঙ্গীয় গবর্ণেণ্টের নিকট এক সুপারিশ-পত্র পাঠাইলেন (২৭ ডিসেম্বর ১৮৪১)। ২৯ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখ হইতে বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০৲ বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন। বর্ত্তমান বাংলার সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাগুরুর ইহাই কর্ম্মজীবনের আরম্ভ।

ক্যাপ্টেন মার্শেল সেরেস্তাদারের কাজে খুশী হইয়া উঠিলেন।

পণ্ডিতের সংস্রবে আসিয়া তিনি ক্রমেই তাঁহার বুদ্ধির সূক্ষ্মতা, জ্ঞানের গভীরতা, কর্ম্মের কর্মঠতা এবং স্থৈর্য্য, তেজস্বিতা ও চরিত্রবলে মুগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই চাকুরী গ্রহণের ফলে, মার্শেল সাহেবের পরামর্শে তাঁহাকে ভাল করিয়া ইংরেজী ও হিন্দী শিখিতে হইল। বিদ্যাসাগরকে সিবিলিয়ান ছাত্রদের পরীক্ষার কাগজ দেখিতে হইত; এই কার্য্যের জন্য ইংরেজী ও হিন্দীর জ্ঞান একান্ত আবশ্যক ছিল। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি অল্পস্বল্প ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, এখন প্রতি দিন বৈকালে শিক্ষকের সাহায্যে ইংরেজী পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধু তালতলা-নিবাসী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরেন্দ্রনাথের পিতা) তাঁহাকে প্রথমে কিছু দিন ইংরেজী পড়াইয়াছিলেন। প্রাতে এক জন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাঁহাকে হিন্দী শিখাইতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্যকালে বিদ্যাসাগর রীতিমত সংস্কৃতের চর্চ্চাও করিয়াছিলেন; এই সময় তিনি সাংখ্য ও পুরাণ ভাল করিয়া অধ্যয়ন করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে থাকিবার কালে অনেক উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ ও গণ্যমান্য দেশীয় বড়লোকের সহিত বিদ্যাসাগরের আলাপ-পরিচয় হয়। ক্যাপ্টেন মার্শেল কাউন্সিল-অব-এডুকেশন বা শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক ডাঃ ময়েটের (Mouat-এর) সহিত বিদ্যাসাগরকে পরিচিত করাইয়া দেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকুরী বিদ্যাসাগরের গতি নির্দ্দেশ করিল।

প্রায় পাঁচ বৎসর কাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্য করিবার পর বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার সুবিধা মিলিল। যে-প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনের ইচ্ছা তিনি মনে মনে পোষণ করিতেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ মার্চ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের পরলোকগমনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। বিদ্যাসাগর এই পদের জন্য ইংরেজীতে একখানি আবেদনপত্র পাঠাইলেন (২৮ মার্চ)। এই আবেদনপত্রের সহিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী মার্শেল সাহেবের একখানি প্রশংসাপত্র ছিল। প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ :—

Certified that Ishwar Chunder Vidyasagar has been Serishtadar of the Bengallee Department of the College of Fort William for nearly five years. He was educated in the Government Sanscrit College and studied all the branches of Literature and Science taught there with the greatest success, and he has since, by private study, acquired a very considerable degree of knowledge of the English Language. I have derived most satisfactory aid from his learning and intelligence in matters connected with his office—and I have also received much willing assistance in others of an extra nature, especially in the annnal examination of candidates for scholarships in the Sanscrit College for the last four years, in which I have been strongly impressed with his tact and intelligence and freedom from all bias or unworthy motives. On the whole, I consider, that he unites in an unusual degree, extensive acquirements, intelligence, industry, good disposition, and high respectability of character.

College of
Fort William
28th March 1846.

G. T. MARSHALL
Secretary College

বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎভাবে আলোচনার পর, তাঁহার আবেদনপত্র সুপারিশ করিয়া, সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্ত ৩১ মার্চ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে পত্র লিখিলেন। ২ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখের পত্রে শিক্ষা-পরিষদ্ বিদ্যাসাগরের নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ফোর্ট

উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগরের স্থানে নিযুক্ত হইলেন তাঁহার ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন (৪ এপ্রিল),—সংস্কৃত কলেজের এক জন কৃতী ছাত্র।]

সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর হইতে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩ এপ্রিল পর্য্যন্ত চার বৎসর চার মাস ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদারের কর্ম্ম করিয়া, ৬ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরীর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর।

বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে যোগদান করিবার কয়েক দিন পরেই—১৩ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে সাহিত্যের অধ্যাপক পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হয়। কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত এই শূন্য পদে বিদ্যাসাগরকেই বসাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। এই পদ গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগরের মাসিক আয় আরও ৪০৲ বাড়িত। কিন্তু এ কাজ তিনি তাঁহার সতীর্থ মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে ছাড়িয়া দিলেন। তর্কালঙ্কার তখন ৫০৲ বেতনে কৃষ্ণনগর কলেজের হেড পণ্ডিত।

বিদ্যাসাগর উৎসাহের সহিত সংস্কৃত কলেজে কাজ করিতে লাগিলেন। সম্পাদকের সাহায্যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ তারিখে এক উন্নত প্রণালীর পঠন-ব্যবস্থার রিপোর্ট সম্পাদকের হস্তে দিলেন। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের যে বৃত্তিপরীক্ষা হয়, মেজর মার্শেল তাহার পরীক্ষক ছিলেন; তিনি পরীক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যের এক স্থলে বিদ্যাসাগরের রিপোর্টের উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি লেখেন :—

The Assistant Secretary consulted me some time ago on a plan of study which he had prepared at a great sacrifice of time and labour. The suggestions therein contained appeared to me well adapted to produce order, to save time, and to secure to each subject of study the degree of attention which it deserves : as such I would beg strongly to recommend the Council to give it a trial. If I am not much mistaken, the result would prove highly satisfactory. *

বিদ্যাসাগর মেজর মার্শেলের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন—এ কথা সম্পাদক রসময় দত্ত জানিতেন। বিদ্যাসাগর তদীয় রিপোর্টটি মার্শেলের গোচর না করিলে, মার্শেলের পক্ষে এই প্রস্তাবিত পঠন-ব্যবস্থার কথা জানা বা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করা কখনই সম্ভবপর হইত না। এই কারণে সম্পাদক রসময় দত্ত তাঁহার সহকারী বিদ্যাসাগরের প্রতি মনে মনে রুষ্ট হইয়াছিলেন। হইবারই কথা। তিনি ছিলেন ঠিকা কর্ম্মচারী, অন্য সরকারী কর্ম্ম বজায় করিয়া কয়েক ঘণ্টা মাত্র সংস্কৃত কলেজের কাজ দেখিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার সহকারী স্বীয় কৃতিত্ববলে কোনরূপে কর্ত্তৃপক্ষের সুনজরে পড়িলে তাঁহার স্বার্থে ঘা পড়িতে পারে। বোধ হয় এই সকল কারণেই তিনি বিদ্যাসাগর-প্রস্তাবিত পঠন-ব্যবস্থা শিক্ষা-পরিষদের গোচর করেন নাই। দু-একটি ছোটখাট প্রস্তাব, যথা,—সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের অধ্যয়নকাল ১২ হইতে ১৫ বৎসরে পরিণত করা ছাড়া বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত কোন সংস্কারই তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

যাহা হউক, কলেজের উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর যখনই যাহা প্রস্তাব

---

* General Report on Public Instruction, in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1846-47 (May 1846—April 1847), pp. 39, 41.

করিতে লাগিলেন, সম্পাদক রসময় দত্ত তাহাতে কর্ণপাত করা সঙ্গত মনে করিলেন না। এই বাধায় বিদ্যাসাগরের জলন্ত উৎসাহ নিমেষে শীতল হইয়া গেল। স্বাধীনচেতা পণ্ডিত চটিয়া কার্য্যে ইস্তফা দিলেন। বন্ধুদের সহস্র অনুরোধ তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের ইহা এক বিশেষত্ব।

১৬ জুলাই ১৮৪৭ তারিখে বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র গৃহীত হইল। তখনকার দিনে এক কথায় ৫০৲ টাকা বেতনের চাকুরী এক জন পণ্ডিত কি করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারেন, বিজয়ী রসময় দত্ত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি নাকি এক জনকে বলিয়াছিলেন, "বিদ্যাসাগর খাবে কি?" এই কথা বিদ্যাসাগরের কর্ণগোচর হইলে তিনি দত্ত-মহাশয়কে জানাইতে বলিয়াছিলেন,—"বোলো বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে।"

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মার্শেল সাহেব ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ও হিতৈষী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়ায় তিনি সেই পদে বিদ্যাসাগরকে নিযুক্ত করিলেন। এই পদ শূন্য হওয়ার ইতিহাসটুকু চিত্তাকর্ষক। দেশবিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথের পিতা তালতলার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরী বজায় রাখিয়াও অতিরিক্ত ছাত্র হিসাবে মেডিক্যাল কলেজে লেকচার শুনিতে যাইতেন। অবশেষে তিনি ডাক্তারি করাই শ্রেয় বলিয়া স্থির করিলেন। ১৬ জানুয়ারি ১৮৪৯ তারিখে দুর্গাচরণ মেজর মার্শেলের হস্তে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। পরবর্ত্তী ১ মার্চ তারিখে পাঁচ হাজার

টাকা জামিন দিয়া মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। *

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কার জজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদ চলিয়া গেলেন। শিক্ষা-পরিষদের সেক্রেটরী ডাঃ ময়েট তাঁহার স্থানে বিদ্যাসাগরকে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু নানা কারণে বিদ্যাসাগর এই পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শেষে ডাঃ ময়েট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় বিদ্যাসাগর জানাইলেন, শিক্ষা-পরিষদ্ তাঁহাকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দিলে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে পারেন। ডাঃ ময়েট বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে ঐ মর্ম্মে একখানি পত্র লিখাইয়া লইলেন।

৪ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছাড়িয়া পরদিন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রকৃত অবস্থা কি, এবং কিরূপ ব্যবস্থা করিলে কলেজের উন্নতি হইতে পারে—এ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য বিদ্যাসাগরের উপর ভার পড়িল। ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর "দীর্ঘচিন্তা ও যথেষ্ট বিবেচনা-প্রসূত" এক বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষা-পরিষদে দাখিল করিলেন। †

* Proceedings of the College of Fort William.—*Home Miscellaneous* No. 575, pp. 598, 650.

† *General Report on Public Instruction*, etc. 1850-51 গ্রন্থের ৩৪-৪৩ পৃষ্ঠায় এই দীর্ঘ রিপোর্ট মুদ্রিত হইয়াছে। সুবলচন্দ্র মিত্রের বিদ্যাসাগর-জীবনীতেও ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

কলেজ-পরিচালনের বিধি-ব্যবস্থা ও পাঠ্য-প্রণালীর বহুবিধ পরিবর্তন সমর্থন করিয়া এই রিপোর্ট লিখিত। পুনর্গঠিত সংস্কৃত কলেজ যে সংস্কৃত বিদ্যানুশীলনের কেন্দ্র ও মাতৃভাষা-রচিত সাহিত্যের জন্মক্ষেত্র হইবে, এবং এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই যে শিক্ষকরূপে এক দিন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, জ্ঞান ও সাহিত্য-রস বিতরণ করিবে,—পরিবর্তনের ফল যে একান্ত শুভ ও আশাপ্রদ, রিপোর্টে তিনি এ কথা দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন।

শিক্ষা-পরিষদ্ এমনই এক জন কার্য্যপটু, দৃঢ়চিত্ত লোককে চাহিতে-ছিলেন। সংস্কৃত কলেজ সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করা যায় কি না—এই কথাই কিছু দিন হইতে তাঁহারা ভাবিতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্ত অবসর গ্রহণ করিলে পুরাতনের বাধা সরিয়া গেল। শিক্ষা-পরিষদ্ বঙ্গীয় গবর্মেণ্টকে লিখিলেন—

> দশ বছর ধরিয়া বাবু রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের কাজ করিয়া আসিতেছেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার জ্ঞান নাই বলিলেও চলে। তাহার উপর সারাদিন তিনি অন্যত্র দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিবিষ্ট থাকেন। কলেজের যখন কাজ চলে, তখন তিনি কলেজে উপস্থিত থাকিতে পারেন না। ফলে কলেজের শৃঙ্খলা শিথিল হইয়াছে। হাজিরা-খাতার উপর মোটেই নির্ভর করা চলে না, এবং নানারূপ গোলমাল ও অব্যবস্থায় কলেজের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—কার্য্যকারিতা একান্তভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অথচ এই বিদ্যালয় এক বিপুল ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান, কারণ কলেজের ছেলেদের নিকট হইতে মাহিনা লওয়া হয় না।
>
> বাংলার সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্যের উন্নতিবিধানের যে আন্দোলন সুরু হইয়াছে, কর্ম্মিষ্ঠ লোকের হাতে পড়িলে সংস্কৃত কলেজ সেই আন্দোলনের সহায়করূপে অনেক কাজ করিতে পারে।

বাবু রসময় দত্তের পদত্যাগে এই প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনের একমাত্র অন্তরায় দূর হইল। কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডাঃ স্প্রেঙ্গার আরবী ভাষায় যেরূপ সুপণ্ডিত, সেইরূপ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত পাওয়া যাইতেছে না। এক্ষেত্রে শিক্ষা-পরিষদের মতে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। এক দিকে তিনি ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ, অন্য দিকে সংস্কৃত-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার মত উদ্যমশীল, কর্ম্মনিপুণ, দৃঢ়চিত্ত লোক বাঙালীর মধ্যে দুর্লভ। তাঁহার রচিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও 'চেম্বার্সের বায়োগ্রাফি'র বঙ্গানুবাদ সমস্ত গবর্মেণ্ট স্কুল-কলেজেই বাংলার পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে পড়ান হয়। তিনি অধ্যক্ষ হইলে বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ দেওয়া যাইতে পারে। সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের পদ উঠিয়া যাইবে। এই দুই পদের বেতন মোট ১৫০্ টাকা। অধ্যক্ষকে এই ১৫০্ টাকা দিলেই চলিবে। সুতরাং এই পরিবর্ত্তনে ব্যয়বৃদ্ধির কোন আশঙ্কা নাই।

গবর্মেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় সম্প্রতি অস্থায়িভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই সংস্কৃত কলেজের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল। (৪ জানুয়ারি, ১৮৫১)

সরকার শিক্ষা-পরিষদের প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। বিদ্যাসাগর মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইলেন (২২ জানুয়ারি ১৮৫১)। এক কথায় কলেজের সংস্কার, পুনর্গঠন ও পরিবর্ত্তনের পূর্ণ অধিকার তাঁহার হাতে দেওয়া হইল।

সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন

১৮৫১ হইতে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ইহার পুনর্গঠনের ইতিহাস। বিদ্যালয়ের শাসনশৃঙ্খলার দিকে বিদ্যাসাগর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন। নিয়মিত উপস্থিতির দিকে নজর রাখা হইল; সামান্ত কারণে শ্রেণীত্যাগ এবং অকারণ গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি নিবারণ করার দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইল। প্রতি অষ্টমী ও প্রতিপদে কলেজের ছুটি বন্ধ করিয়া সপ্তাহান্তে রবিবারে ছুটির দিন ধার্য্য হইল। পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্রই সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকারী ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন—দেশে শিক্ষাবিস্তার ও লোকের জ্ঞানবৃদ্ধির পরম বন্ধু। তিনি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রথমে কায়স্থ, পরে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যে-কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের হিন্দুকে সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অবাধ অনুমতি দিলেন।

বিদ্যাসাগর নিজের কলেজের জন্য আর একটি কাজ করিলেন। সংস্কৃত কলেজের সম্মান ও ছাত্রদের ভবিষ্যতের উপরও যে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল, ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুকলেজ ও মাদ্রাসার পাস-করা কৃতবিদ্য ছাত্রদের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দেওয়া হইত। বিদ্যাসাগর শিক্ষা-পরিষদের মধ্য দিয়া গবর্মেণ্টের কাছে সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য ছাত্রদিগকে এই বিষয়ে সমান সুযোগ ও সুবিধা দিবার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা জানাইলেন (১৩ জানুয়ারি ১৮৫২)। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগকে পরে ডেপুটিগিরি দেওয়া হইত।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা হইতে সংস্কৃত কলেজ অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। ফলে দাঁড়াইয়াছিল এই, ছাত্রেরা বিনা প্রতিবন্ধে কলেজে প্রবেশলাভ করিতে পারিত এবং পরে সুবিধা পাইলেই অন্য ইংরেজী

বিদ্যালয়ে চলিয়া যাইত। এমনও হইত, ভর্তি হইয়া নাম লিখাইয়া ছেলের আর দেখা নাই, তার পর দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে যখন হাজিরা-খাতা হইতে নাম কাটা গেল, তখন ছাত্র অথবা ছাত্রের অভিভাবক এমন করিয়া আসিয়া কর্তৃপক্ষকে ধরিয়া পড়িল যে, নিবেদন অগ্রাহ্য করা দুরূহ। এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিদ্যাসাগর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রথমে দুই টাকা প্রবেশ-দক্ষিণার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন। পুনঃপ্রবেশের জন্যও ঐ ব্যবস্থা বাহাল হইল। তার পর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি মাসিক এক টাকা বেতনের বন্দোবস্ত হইল। ইহাতে অব্যবস্থিতচিত্ত ছাত্রদের কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইল, বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির হারও যথেষ্ট বাড়িয়া গেল।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজে এক উন্নত প্রণালীর শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। ব্যাকরণ-বিভাগ সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হইল। পূর্ব্বে বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ' ছিল ব্যাকরণের একমাত্র পাঠ্য পুস্তক। সংস্কৃত শিক্ষার গোড়াতেই সংস্কৃতে লেখা এই দুরূহ ব্যাকরণখানি ছেলেদের পড়িতে হইত। এখানি আয়ত্ত করিতে লাগিত —চার-পাঁচ বৎসর, তাও ছেলেরা অর্থ না বুঝিয়াই মুখস্থ করিত। কাজেই সংস্কৃত-সাহিত্য পড়িবার সময় এই মুখস্থ বিদ্যা বিশেষ কাজে লাগিত না, দেখা যাইত, ভাষায় তাহারা আশানুরূপ অধিকার লাভ করে নাই। বিদ্যাসাগর ছেলেদের বাধাটুকু বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, বাঙালী ছাত্রকে সংস্কৃত শিখাইতে হইলে বাংলায় ব্যাকরণ পড়াইতে হইবে। তিনি 'মুগ্ধবোধ' পড়ান বন্ধ করিলেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে বাংলায় লেখা স্বরচিত 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' ধরাইলেন। এই সঙ্গে 'ঋজুপাঠ'ও পড়ান হইতে লাগিল। সংস্কৃত গদ্য ও কাব্য হইতে কতকগুলি নির্ব্বাচিত অংশ

'ঋজুপাঠে' সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই নব ব্যবস্থার ফল ভালই হইল। সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে এই ব্যবস্থায় সংস্কৃতে মোটামুটিরূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে তিন বৎসরের বেশী সময় লাগে না।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষায় বাধাবিপত্তি এমনি করিয়া দূর করিলেন। অতঃপর তিনি সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-বিভাগ পুনর্গঠনের কাজে হস্তক্ষেপ করিলেন।

দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; প্রথম, হিন্দু সাহিত্যের অনুশীলন; দ্বিতীয়, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রম-প্রচলন। বাংলা-সাহিত্যে পাশ্চাত্য ভাবের আমদানি এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সংস্কৃত কলেজে একটি ইংরেজী-শ্রেণী খোলা হয়, কিন্তু ইহা আট বৎসর মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শিক্ষা-পরিষদের চেষ্টায় এই শ্রেণী পুনঃস্থাপিত হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাসাগর এই ইংরেজী-বিভাগের শিক্ষা-প্রণালীর ভিতরের গলদ বেশ বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়া তিনি ইহাকে ফলপ্রসূ করিতে সচেষ্ট হইলেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইংরেজী-বিভাগে একটি অধিকতর বিস্তৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বিত হইল। পাঁচ জন শিক্ষকের মধ্যে মাসিক এক শত টাকা বেতনে প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী হইলেন ইংরেজীর অধ্যাপক ও শ্রীনাথ দাস হইলেন গণিতের অধ্যাপক। পূর্ব্বে সংস্কৃতে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপনা চলিত—ভাস্করাচার্য্যের 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিত' ছাত্রদিগকে পড়িতে হইত। বিদ্যাসাগর ইহা উঠাইয়া দিয়া অতঃপর ইংরেজীতেই গণিতের শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিলেন। এখন হইতে ইংরেজী অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়-সমূহের অন্তর্গত করা হইল।

বিদ্যাসাগর যখন এই সব সংস্কারে ব্রতী, সেই সময় শিক্ষা-পরিষদ্‌ কাশীর সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ—বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ জে. আর. ব্যালান্টাইনকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিতে আহ্বান করিলেন। শিক্ষা-পরিষদের নিমন্ত্রণে ডাঃ ব্যালান্টাইন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলেন (জুলাই-আগস্ট ১৮৫৩)। পরিদর্শনান্তে একটি রিপোর্ট পরিষদে পেশ করিলেন :—

> ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের খ্যাতির কথা শুনিয়া এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ-সম্পর্কে তৎপ্রদত্ত রিপোর্ট পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মিয়াছিল, এই সুধী অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ আলাপে আমার সে ধারণা দৃঢ়তর হইল,—এই আলাপে আমি যথেষ্ট আনন্দলাভ করিলাম।

কলেজের গঠন-ব্যবস্থা প্রভৃতির বিষয়ে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিবার পর তিনি কাশী ও কলিকাতা—এই উভয় সংস্কৃত কলেজের অবস্থার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বারাণসীতে আবশ্যিক 'ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত করা যে সম্প্রতি অসমীচীন, এই মত প্রকাশ করেন। তার পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে নূতন কতকগুলি পুস্তক প্রবর্তন ও ছাত্রদের ভাবগ্রহণ করিবার শক্তি সম্বন্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেন, তাহা বিদ্যাসাগরের পরবর্তী রিপোর্ট হইতে জানা যাইবে। নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ডাঃ ব্যালান্টাইন তাঁহার রিপোর্ট শেষ করিয়াছেন :—

> ভারতীয় পাণ্ডিত্য ও ইংরেজী বিজ্ঞানের মধ্যে যে প্রভেদ বর্ত্তমান, তাহা ঘুচাইবার জন্যই আমি এই সকল কথার অবতারণা করিয়াছি।… কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজী এই উভয়বিধ পাঠ্যই পড়িতে হয় বটে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় উভয় ভাষায় শাস্ত্রের কোথায় মিল, কোথায় অমিল—তাহা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিজেদেরই ঠিক করিয়া লইতে হয়।

ছাত্রদের অবধারণ যে সন্তোষজনক নয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং সেই জন্যই কলেজের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়া অতিরিক্ত আরও যে যে গ্রন্থের প্রচলন প্রয়োজন, তাহার প্রস্তাব করিয়াছি··· ।

শিক্ষা-পরিষদ্ ডাঃ ব্যালান্টাইনের রিপোর্ট বিদ্যাসাগরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন (২৯ আগস্ট ১৮৫৩)। বিদ্যাসাগর ডাঃ ব্যালান্টাইনের বর্ণিত প্রণালীর সমর্থন করিতে না পারিয়া পরিষদের নিকট যে উত্তর প্রেরণ করেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল :—

> বিদ্যালয়ে যে-সকল ব্যবস্থা সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ডাঃ ব্যালান্টাইনের মত গুণী লোকের অনুমোদন লাভ করিয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।
>
> ডাঃ ব্যালান্টাইনের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক প্রচলন বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। মিলের লজিকের যে সংক্ষিপ্তসার তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, সংস্কৃত কলেজে পাঠ্য পুস্তকরূপে তাহাই তিনি প্রবর্ত্তিত করিতে চান। বর্ত্তমান অবস্থায়, আমার মতে, সংস্কৃত কলেজে মিলের গ্রন্থ পড়ান একান্ত প্রয়োজন। মিলের পুস্তকের মূল্য অধিক ;— ডাঃ ব্যালান্টাইনের সংক্ষিপ্তসারের প্রচলন প্রস্তাবের প্রধান কারণ ইহাই মনে হয়। আমাদের ছাত্রদের প্রামাণিক গ্রন্থ-সমূহ একটু বেশী দাম দিয়াও কিনিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে ; কাজেই মূল্যাধিক্যের জন্য এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রচলন হইতে বিরত থাকিবার কারণ নাই। ডাঃ ব্যালান্টাইন বলেন, তাঁহার সংক্ষিপ্তসার মিলের লজিকের মুখবন্ধ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু মিল নিজে তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় বিশেষভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে, আর্চবিশপ হোয়েটলির তর্কশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থই তাঁহার লজিকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপক্রমণিকা। অতএব এ-বিষয়ে বিবেচনার ভার শিক্ষা-পরিষদের উপর রহিল। ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ বেদান্ত, ন্যায় ও সাংখ্য-দর্শনের তিনখানি

পাঠ্য পুস্তক প্রবর্তনের প্রস্তাবও তিনি করিয়াছেন। 'বেদান্তসার' পূর্ব হইতেই পাঠ্যরূপে সংস্কৃত কলেজে গৃহীত; ইহার ইংরেজী অনুবাদ পড়ান যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত ন্যায়-সম্বন্ধীয় 'তর্কসংগ্রহ' এবং সাংখ্য-সম্পর্কিত 'তত্ত্বসমাস' নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ। আমাদের পাঠ্যসূচিতে উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুস্তকের নির্দ্দেশ আছে। বিশপ বার্কলের *Inquiry* সম্বন্ধে আমার মত এই যে, পাঠ্য পুস্তকরূপে ইহার প্রবর্ত্তনে সুফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনাই অধিক। কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত না পড়াইয়া উপায় নাই। সে-সকল কারণের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ-সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই। মিথ্যা হইলেও হিন্দুদের কাছে এই দুই দর্শন অসাধারণ শ্রদ্ধার জিনিস। সংস্কৃতে যখন এগুলি শিখাইতেই হইবে, ইহাদের প্রভাব কাটাইয়া তুলিতে প্রতিষেধকরূপে ইংরেজীতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ান দরকার। বার্কলের *Inquiry* বেদান্ত বা সাংখ্যের মত একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে; ইউরোপেও এখন আর ইহা খাঁটি দর্শন বলিয়া বিবেচিত হয় না, কাজেই ইহাতে কোন ক্রমেই সে কাজ চলিবে না। তা ছাড়া হিন্দু-শিক্ষার্থীরা যখন দেখিবে, বেদান্ত ও সাংখ্য-দর্শনের মত এক জন ইউরোপীয় দার্শনিকের মতের অনুরূপ, তখন এই দুই দর্শনের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা কমা দূরে থাকুক, বরং আরও বাড়িয়া যাইবে। এ অবস্থায় বিশপ বার্কলের গ্রন্থ পাঠ্য পুস্তকরূপে প্রচলন করিতে আমি ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত একমত নহি।

সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় প্রকারের পাঠ-পদ্ধতিই যে ভাল, এ কথা ডাঃ ব্যালাণ্টাইন স্বীকার করিয়াছেন। অথচ উভয়বিধ পাঠের ফলে "সত্য দ্বিবিধ"—এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাত্রদের মনে জন্মিতে পারে, এ ভয় করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—"এ ভয় অলীক নয়।

সংস্কৃত-শাস্ত্রে পণ্ডিত অথচ ইংরেজীতেও অভিজ্ঞ ব্যক্তি এমন-সব ব্যক্তিদের জানি, যাঁহারা পাশ্চাত্য লজিক ও সংস্কৃত ন্যায়—এই উভয় শাস্ত্রের মত ঠিক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু উভয়ের মূল তত্ত্বের ঐক্য সম্বন্ধে কোন ধারণা তাঁহাদের নাই এবং সেজন্য এক ভাষায় অন্যটির চিন্তাপদ্ধতি প্রকাশ করিতে অক্ষম।” আমার বিশ্বাস, যে-লোক সংস্কৃত ও ইংরেজী—এই উভয় ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের মত পাঠ করিয়াছে—বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে—তাহার সম্বন্ধে এইরূপ ভয় করিবার কোন কারণ নাই। যে যথার্থরূপে ধারণা করিয়াছে, তাহার কাছে সত্য—সত্যই। “সত্য দুই রকমের” এই ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল। সংস্কৃত কলেজে আমরা যে-শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে এইরূপ ফলের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই দূর হইবে। যেখানে দুইটি সত্যের মধ্যে প্রকৃতই মিল আছে, সেখানে সেই ঐক্য যদি কোন বুদ্ধিমান্ ছাত্র বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে সেরূপ ঘটনা সত্যই অদ্ভুত বলিতে হইবে। ধরা যাক, ইংরেজী ও সংস্কৃত—উভয় ভাষাতেই ছাত্রেরা লজিক, অথবা দর্শন বিজ্ঞানের যে-কোন বিভাগ অধ্যয়ন করিল। এখন যদি তাহারা বলে, “লজিকের পাশ্চাত্ত্য থিয়োরিও সত্য, হিন্দু থিয়োরিও সত্য,” অথচ যদি তাহারা উভয়ের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান না পায়, এবং না পাইয়া এক ভাষার সত্য অন্য ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হয় তাহারা বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, না-হয় যে-ভাষায় তাহারা নিজেদের ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম, সেই ভাষায় তাহাদের জ্ঞান অল্প। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দু-দর্শনে এমন অনেক অংশ আছে, যাহা ইংরেজীতে সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করা যায় না; তাহার কারণ, সে-সব অংশের মধ্যে পদার্থ কিছু নাই।

ডাঃ ব্যালান্টাইন আরও বলেন,—“বর্ত্তমান সংস্কৃত কলেজের

পঠন-পদ্ধতি এবং ছাত্রদের সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষায় শিক্ষার রীতি হইতেই বুঝা যায়, এমন এক দল লোক গড়িয়া তোলা দরকার, যাহারা পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিবে, এবং উভয় দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিভাষী ব্যাখ্যাতার কার্য্য করিয়া উভয়ের মধ্যে যেখানে দৃশ্যতঃ অনৈক্য, সেইখানে সত্যকার মিল দেখাইয়া দিয়া অনাবশ্যক কুসংস্কার দূর করিবে ;—হিন্দুর দার্শনিক আলোচনা যে-সকল প্রাথমিক সত্যে পৌঁছিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে তাহাদের পূর্ণতর বিকাশ দেখাইয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করিবে।" দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে আমি ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত একমত। আমার মনে হয় না, আমরা সকল জায়গায় হিন্দুশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঐক্য দেখাইতে পারিব। যদি-বা ধরিয়া লওয়া যায় ইহা সম্ভব, তবুও আমার মনে হয়, উন্নতিশীল ইউরোপীয় বিজ্ঞানের তথ্য-সকল ভারতীয় পণ্ডিতগণের গ্রহণযোগ্য করা দুঃসাধ্য। তাহাদের বহুকাল-সঞ্চিত কুসংস্কার দূর করা অসম্ভব। কোন নূতন তত্ত্ব, এমন কি, তাহাদের শাস্ত্রে যে তত্ত্বের বীজ আছে, তাহারই পরিবর্দ্ধিত স্বরূপ—যদি তাহাদের গোচরে আনা যায়, তবে তাহারা গ্রাহ্য করিবে না। পুরাতন কুসংস্কার তাহারা অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। আরব-সেনাপতি অমরু আলেকজেন্ড্রিয়া বিজয় করিয়া যখন খালিফ ওমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল—আলেকজেন্ড্রিয়ার গ্রন্থশালার ব্যবস্থা কি করা যাইতে পারে, তখন খালিফ উত্তর দিলেন, "গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি হয় কোরাণের মতের অনুযায়ী, না-হয় বিরুদ্ধ ; যদি অনুরূপ হয় ত এক কোরাণ থাকিলেই যথেষ্ট ; আর যদি বিরুদ্ধ মত হয় ত গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই অনিষ্টকর। অতএব ওগুলি ধ্বংস কর।" আমার বলিতে লজ্জা হয়—ভারতীয় পণ্ডিতগণের গোঁড়ামি ঐ আরব-খালিফের গোঁড়ামির চেয়ে কিছু কম নয়। তাহাদের বিশ্বাস, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিদের মস্তিষ্ক হইতে শাস্ত্র নির্গত হইয়াছে, অতএব

শাস্ত্র-সমূহ অভ্রান্ত। আলাপ অথবা আলোচনার সময় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নূতন সত্যের কথা অবতারণা করিলে, তাহারা হাসি-ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দেয়। সম্প্রতি ভারতবর্ষের এই প্রদেশে—বিশেষতঃ কলিকাতা ও তাহার আশে পাশে—পণ্ডিতদের মধ্যে একটি মনোভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে; শাস্ত্রে যাহার অঙ্কুর আছে, এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনিলে, সেই সত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা দেখান দূরে থাক, শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হয় এবং 'আমাদেরই জয়' এই ভাব ফুটিয়া উঠে। এই সব বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করাইবার কোন আশা আছে, এমন আমার বোধ হয় না। যে-প্রদেশের পণ্ডিতদের দেখিয়া ডাঃ ব্যালান্টাইন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া এই সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহার মত খাটাইলে সুফল পাইবার সম্ভাবনা।

বাংলার কথা স্বতন্ত্র। 'দুই স্থানের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত' এবং 'জোর করিয়া সামঞ্জস্য-বিধান বিজ্ঞের কার্য্য নহে'—তাঁহার এই মন্তব্যগুলি খুবই সমীচীন। ভারতবর্ষের এই অংশের স্থানীয় অবস্থার দরুণ শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যে আমাদের ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আমি সযত্নে এখানকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; তাহাতে আমার মনে হইয়াছে, দেশীয় পণ্ডিতদের কোন-কিছুতে হস্তক্ষেপ করা মোটেই উচিত নয়। তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের প্রয়োজন নাই; কেন-না, আমরা তাঁহাদের কোনরূপ সাহায্য চাই না। আজ ইঁহাদের সম্মানও লুপ্তপ্রায়, কাজেই এই দলকে ভয় করিবার কারণ দেখি না। ইঁহাদের কণ্ঠ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। এ-দলের পূর্ব্ব-আধিপত্য ফিরিয়া পাইবার আর বড় সম্ভাবনা নাই। বাংলা দেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে,

সেইখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমিয়া আসিতেছে ; দেখা যাইতেছে, বাংলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের জন্ত অত্যন্ত ব্যগ্র। দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তুষ্টি না করিয়াও আমরা কি করিতে পারি, তাহা দেশের বিভিন্ন অংশে স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাই আমাদের শিখাইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার—ইহাই এখন আমাদের প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করিতে হইবে, এই সব স্কুলের জন্ত প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে হইবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিতে পারে, এমন এক দল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে ; তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি,—শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরণের দরকারী লোক গড়িয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য—আমার সঙ্কল্প। ইহার জন্ত আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইবে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা কলেজের পাঠ শেষ করিয়া এই ধরণের লোক হইয়া উঠিবে—এমন আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এ আশা অলীক নয়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা যে বাংলা ভাষায় পূর্ণ অধিকারী হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। ইংরেজী-বিভাগের পুনর্গঠনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যদি মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যেও যে তাহারা যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ ও তাহার ফলে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে জ্ঞানলাভ করিবে, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সুখের বিষয়, সম্প্রতি তাহাদের চিন্তাধারার এমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, মনে হয়, অতঃপর প্রত্যেক উপযুক্ত ছাত্রই দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবে। এখানকার সংস্কৃত কলেজের কাছে কি আশা করা যাইতে পারে, তাহার নমুনাস্বরূপ রিপোর্টের সঙ্গে গত বর্ষের একটি বাংলা প্রবন্ধের ইংরেজী

অনুবাদ পাঠাইলাম (?) প্রবন্ধটির লেখক—দর্শন-বিভাগের ছাত্র রামকমল শর্ম্মা। রামকমল এই বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র, কলেজের পাঠ শেষ করিতে তাহার এখনও তিন বৎসর বাকী, এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে সে এখনও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

শিক্ষা-পরিষদ্ সব দিক্ বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন :—

> ডাঃ ব্যালাণ্টাইন সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও উন্নতির সম্বন্ধে এমন অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া শিক্ষা-পরিষদ্ আনন্দিত।...পরিষদ্ চান যে, অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সংক্ষিপ্ত-সার ও অন্যান্য গ্রন্থ অবাধে ব্যবহার করেন। তাঁহার নিজের ও তাঁহার অধীন শিক্ষকদের পাঠনার অন্তর্গত বিষয়সমূহের অর্থ বুঝাইবার ও উদাহরণ দিবার জন্য এগুলি অত্যন্ত কাজে লাগিবে। ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের গ্রন্থের সহিত পরিচয়ে এই সব বিষয়ের শিক্ষার্থিগণ যথেষ্ট উপকৃত হইবে। তাঁহার বিদ্যালয়ের উন্নতি সম্বন্ধে অধ্যক্ষ যেন ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত সর্ব্বদা পত্র-ব্যবহার করেন। কাশী ও কলিকাতা —এই দুইটি প্রধান বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রমিক উন্নতি সম্বন্ধে অবাধে মতের বিনিময় করেন, ইহাই শিক্ষা-পরিষদের ইচ্ছা। (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩)।

সংস্কৃত কলেজ নূতন করিয়া গড়িবার জন্য বিদ্যাসাগর প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় শিক্ষা-পরিষদের এই আদেশ তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। তিনি নিজ কার্য্যে অন্যের হস্তক্ষেপ সহিতে পারিতেন না এবং যাহা ঠিক বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইতে এক চুলও নড়িতেন না। ৫ অক্টোবর ১৮৫৩ তারিখে শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক ডাঃ ময়েটকে লিখিত এই আধা-সরকারী চিঠিখানি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :—

ডাঃ ব্যালান্টাইনের রিপোর্ট-সম্পর্কে শিক্ষা-পরিষদের আদেশ স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম; সেই আদেশগুলি হুবহু প্রতিপালন করিতে গেলে, পরিষদের অনুমতিক্রমে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজে প্রবর্ত্তন করিয়াছি, তাহাতে অযথা হস্তক্ষেপ করা হইবে। ফলে কলেজে আমার অবস্থা কতকটা অপ্রীতিকর, এবং বিভালয়ের প্রয়োজনীয়তার দিক্ দিয়াও ক্ষতিকর হইবে।

কলেজ বন্ধ এবং বাড়ী যাইবার উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যস্ততার দরুন আমি এ-বিষয়ে সরকারী চিঠি লিখিতে পারিলাম না। ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর আপত্তি আমার মনে আসিয়াছে; কলিকাতা-ত্যাগের পূর্ব্বে তাহা আমি জানাইয়া যাইতে চাই।

যে শিক্ষা-ব্যবস্থার আমি অনুমোদন করিতে পারি না, তাহাই গ্রহণ করিতে, অথবা আমার সমপদস্থ এক জন অধ্যক্ষের সহিত বিদ্যালয়ের উন্নতির সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহার করিতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে মর্য্যাদাহানির যে কথা আছে, এমন একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে সেই ব্যক্তিগত কথা সম্প্রতি আমি মিশাইতে চাহি না; এই সব সর্ত্তে কাজ করিতে কোন শিক্ষিত ইংরেজই রাজী হইতেন না। ব্যক্তিগত আপত্তি ছাড়িয়া, প্রকৃত বিষয়ে অবতীর্ণ হইতেছি।

মনে হয়, ডাঃ ব্যালাণ্টাইন এই ভাবিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য না হইলে ইংরেজী সংস্কৃতের ছাত্রেরা 'দুইরূপ সত্যের' অনুবর্ত্তী হইয়া পড়িবে। তাঁহার কাশীর পণ্ডিত-বন্ধুগণের মনোবৃত্তির সম্বন্ধে আমি কোন প্রশ্ন তুলিব না। কিন্তু এ কথা আমি জানি এবং জোর করিয়া বলিতে পারি, বঙ্গদেশে এমন এক জনও বুদ্ধিমান্ লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যিনি সংস্কৃত ও ইংরেজীতে শিক্ষিত হইয়া মনে করেন, 'সত্য দুই প্রকার।'

বাংলায় "যথার্থ"অধিকারী করিবার জন্য যদি আমি সংস্কৃত শিখাইতে পারি, তার পর যদি ইংরেজীর সাহায্যে ছাত্রদের মনে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার করিতে পারি এবং আমার কার্য্যে শিক্ষা-পরিষদের সাহায্য ও উৎসাহ পাই, তাহা হইলে এ-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন এক দল যুবক তৈয়ারী করিয়া দিব, যাহারা নিজ রচনা ও পড়াইবার গুণে আপনাদের ইংরেজী অথবা দেশীয় যে-কোন কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রদের অপেক্ষা ভালরূপে দেশের লোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিতে পারিবে। আমার এই একান্ত অভিলাষ—এই মহৎ উদ্দেশ্য কার্য্যকর করিবার জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে হইবে। ডাঃ ব্যালান্টাইন-কৃত সংক্ষিপ্ত-সার ও গ্রন্থের যেগুলি আমি অনুমোদন করিতে পারি—যেমন *Novum Organum*-এর সুন্দর ইংরেজী সংস্করণ—তাহা আনন্দসহকারে সত্বর বিদ্যালয়ে চালাইব। কিন্তু তাহাদের প্রয়োজন, মূল্য অথবা আমি যেখানকার অধ্যক্ষ, সেই বিদ্যালয়ের বিশেষ অভাব ও অবস্থার সম্বন্ধে আমার বিবেচনার উপর নির্ভর না করিয়াই যদি আমাকে তাঁহার গ্রন্থগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—'আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে।' এইরূপ ব্যবস্থা আমার প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির বাধা জন্মাইবে এবং শিক্ষা-পরিষদের কর্ম্মচারী হিসাবে আমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান সম্বন্ধেও যে-দায়িত্ব আমি তীব্রভাবে বোধ করি, তাহা একেবারে নষ্ট না হউক—ক্ষীণ হইয়া আসিবে।

আশা করি, ব্যস্তভাবে লিখিত আমার বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিতগুলি শিক্ষা-পরিষদ্ সদয়ভাবে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের প্রস্তাব কতকটা পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবেন,—যাহাতে সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্দ্দেশিত শিক্ষা-ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক না হইয়া পড়ে।

যদি দরকার হয়, কলেজের অবকাশের পর আমি এই বিষয়ে সরকারী—সুতরাং অধিকতর কেতাদুরস্ত—পত্র লিখিব।

এই পত্রখানিতে সুফল ফলিয়াছিল। বিদ্যাসাগর নিজের ব্যবস্থিত শিক্ষা-প্রণালী অনুসরণ করিবার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী যে সুফলপ্রসূ হইয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে। এই সাফল্যের একটি প্রধান কারণ,—নিজের তাঁবে ঠিক ধরণের লোক বাছিয়া লইবার অদ্ভুত ক্ষমতা বিদ্যাসাগরের ছিল। সংস্কারের ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদ্ সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে বিদ্যাসাগরের বেতন বাড়াইয়া তিন শত টাকা করিয়া দেন।

রাজকর্মচারীরা বিদ্যাসাগরকে সম্মান করিয়া চলিতেন। শিক্ষা-বিষয়ক কার্য্যে তাঁহারা পণ্ডিতের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সিভিলিয়ান-দিগকে প্রাচ্যভাষা শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ভাঙিয়া ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বোর্ড অব একজামিনার্স গঠিত হইলে বিদ্যাসাগরকে বোর্ডের এক জন কর্ম্মী-সদস্য করিয়া লওয়া হইয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদের সদস্য ও বাংলার প্রথম ছোট লাট ফ্রেডারিক হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে পরিষদ্ বারাসতের নিকটবর্ত্তী বামুনমুড়া বঙ্গবিদ্যালয় প্রদর্শন করিতে বিদ্যাসাগরকে পাঠাইয়াছিলেন (জুলাই, ১৮৫৪)।

শুধু পণ্ডিত নয়, বিদ্যাসাগর সাহিত্য-রসিক ছিলেন। বাংলার বহু সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি কোন-না-কোনরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলিকাতার ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি নানাবিধ উত্তম পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিতেন। এই সভার উপর বিদ্যাসাগরের কর্ত্তৃত্ব ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে একটি প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন সমিতি গঠিত হইয়াছিল; বিদ্যাসাগর এই সমিতিরও একজন সভ্য ছিলেন।

কিন্তু সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কারই শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগরের শেষ ও প্রধান কার্য্য নহে।

বাংলা-শিক্ষা প্রচলন

তখনকার কালে দেশবাসীর শিক্ষার দিকে ভারত-সরকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। সংস্কৃত ও আরবীর জন্য সরকার কিছু টাকা ব্যয় করিতেন মাত্র। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গবর্নর-জেনারেল বেণ্টিঙ্ক মিনিটে লিখিলেন,—"ভারতবাসী জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রচারই ব্রিটিশ-রাজের মহৎ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং শিক্ষা-বাবদ সকল মঞ্জুরী অর্থ শুধু ইংরেজী-শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলেই ভাল হয়।" এই গুরুতর সিদ্ধান্তের দিন হইতে গবর্ণেণ্ট ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়াই শিক্ষা-ব্যবস্থায় উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। বেণ্টিঙ্কের নব ব্যবস্থায় উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষা-সম্পর্কিত অভাবই দূর হইতে পারে। সেই হেতু শিক্ষা-বিষয়ে সাধারণের দাবি বিশেষভাবে উপস্থাপিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইংরেজী কিংবা সংস্কৃত ভাষার ভিতর দিয়া ত আর দেশের লোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারা যায় না;—মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই জনসাধারণ জ্ঞানলাভ করে। এই দিক্ দিয়া প্রথম প্রচেষ্টার সম্মান সার্ হেনরী হার্ডিঞ্জের প্রাপ্য। দেশীয় ভাষার ভিতর দিয়া প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য, আর্থিক অসচ্ছলতার অসুবিধাসত্বেও, তিনি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নানা স্থানে (মাসিক ১৮৬৫৲ টাকা ব্যয়ে) ১০১টি পল্লী-পাঠশালা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন (অক্টোবর, ১৮৪৪)। বিদ্যাসাগর এই কার্য্যে ঘনিষ্ঠভাবে

যুক্ত ছিলেন। তিনি এইগুলির শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল পাঠশালার জন্য শিক্ষক নির্বাচনের ভার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী মার্শেল ও বিদ্যাসাগরের উপর ছিল।

কিন্তু প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক, শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতির অভাবে হার্ডিঞ্জের প্রচেষ্টা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই। চারি বৎসর যাইতে-না-যাইতেই পাঠশালাগুলির তত্ত্বাবধায়ক—বোর্ড অফ রেভিনিউ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—"সফলতা অসম্ভব, বাংলা পাঠশালাগুলির আর কোন আশা নাই।" তাহার পর হইতে সাধারণের শিক্ষার জন্য সরকার আর বিশেষ কিছু করেন নাই। সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার যে এক অসম্ভব কাজ নয়, ভারতবর্ষের অপর এক প্রদেশের শাসনকর্তা সে-কথা প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কতকগুলি নির্ব্বাচিত জেলায়, ছোট লাট টমাসন্ কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত দেশীয় ভাষায় শিক্ষা-প্রণালী যে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছে, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তৎসম্বন্ধীয় রিপোর্ট বড় লাটের হস্তগত হইল। বঙ্গ ও বিহারে এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, সে কথা কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের তিনি বিশেষ করিয়া জানাইলেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পৌছিবার পূর্ব্বেই বাংলা-সরকারকে ঐ বিষয়ে মতামত জানাইতে অনুরোধ করিলেন (৪ নবেম্বর ১৮৫৩)। একটি সুসম্বদ্ধ বাংলা শিক্ষা-প্রণালী কি উপায়ে ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত এবং সুরক্ষিত করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে এক খসড়া তৈয়ারী করিবার জন্য বঙ্গীয় গবর্ণেমেন্ট শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লিখিলেন (১৯ নবেম্বর)। মাতৃভাষায় শিক্ষা-সম্বন্ধে অ্যাডাম সাহেবের রিপোর্ট এবং টমাসনের ব্যবস্থাকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া সেই খসড়া তৈয়ারী করিতে হইবে।

৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৪ তারিখে পরিষদ্ ঐ বিষয়ে সদস্যদিগের মিনিটগুলি বঙ্গীয় গবর্মেন্টকে পাঠাইলেন।

বাংলায় ছোট লাটের পদ সৃষ্ট হইল (১ মে ১৮৫৪); প্রথম ছোট লাট হইলেন—ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে। এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার দুই মাস পূর্ব্বে শিক্ষা-পরিষদের সদস্যরূপে হ্যালিডে বাংলায় শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহার মত একটি মিনিটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন (২৪ মার্চ)। শিক্ষা-পরিষদ্-প্রদত্ত কাগজপত্র পর্য্যালোচনা করিয়া হ্যালিডে স্থির করিলেন, তিনি নিজে যে-প্রণালী পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বড় লাটের গ্রহণার্থ ইহাই তিনি অনুমোদন করিয়া পাঠাইলেন (১৬ নবেম্বর)। হ্যালিডের মিনিটের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা গেল :—

২। বঙ্গদেশে অসংখ্য দেশীয় ধরণের পাঠশালা আছে। ইউরোপীয় এবং এদেশীয়—উভয় শ্রেণীর ভদ্রলোকের কাছে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, পাঠশালাগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়; কারণ, শিক্ষকের কার্য্য অতি অযোগ্য লোকের হাতেই গিয়া পড়িয়াছে।

৩। এই পাঠশালাগুলিকে যথাসম্ভব উন্নত করিয়া তোলা আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। এ-বিষয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্ব্বতন ছোট লাটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই শ্রেয়। পাঠশালাগুলির আদর্শস্বরূপ কতকগুলি মডেল স্কুলের ব্যবস্থা করা দরকার। নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিলে, গুরু মহাশয়েরা আদর্শের প্রেরণায় ক্রমশঃ পাঠশালাগুলিকে উন্নত ধরণে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে।

৫। এই বিষয়-সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের সুদক্ষ অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা এক মন্তব্য সংযুক্ত হইল। এ কথা সকলেই জানেন, ইনি বাংলা-শিক্ষা প্রচারকার্য্যে বহুদিন হইতেই অত্যন্ত উৎসাহী। সংস্কৃত কলেজে নব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য

প্রাথমিক পুস্তক-সমূহ রচনা করিয়া এ-সম্বন্ধে উনি যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন।

৬। অধ্যক্ষের মন্তব্যান্তর্গত শিক্ষা-প্রণালী আমি সাধারণভাবে অনুমোদন করি। ইহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহাই আমার অভিপ্রেত।

১৩। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের, এবং এ-বিষয়ে যাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত এই—সরকারী মডেল স্কুলে প্রবেশ-দক্ষিণা প্রথম-প্রথম কিছু না থাকাই উচিত, অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত দেশীয় বিদ্যালয়ের মত এগুলিও নিশ্চয়ই নিজেদের খরচা নিজেরাই চালাইতে পারিবে।

২৮। শিক্ষক তৈয়ারী করিবার জন্ত নর্মাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তার কথা কিছু বলি নাই। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষায় এখন বেশ ভাল শিক্ষক গড়িয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান অধ্যক্ষের হাতে পড়িয়া সংস্কৃত কলেজ বাংলা দেশে নর্মাল স্কুলের স্থান অধিকার করিয়াছে।*

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, হ্যালিডের মিনিটের মূল উৎস ছিল—বিদ্যাসাগরের নিপুণ মন্তব্য। বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি-সম্পর্কে এই মন্তব্যের অন্তর্গত নির্দ্দেশগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই পরবর্ত্তী কালে গৃহীত হইয়াছিল। এই কারণে বিদ্যাসাগরের মন্তব্যটির বঙ্গানুবাদ দেওয়া প্রয়োজন :—

১। সুবিস্তৃত এবং সুব্যবস্থিত বাংলা-শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কেন-না, মাত্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব।

* হ্যালিডের এবং শিক্ষা-পরিষদের সদস্যগণের মিনিটগুলি—*Selections from the Records of the Bengal Govt.*, No. xxii—Correspondence relating to Vernacular Education (Calcutta, 1855) গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

২। লেখা, পড়া, আর কিছু অঙ্ক শেখাতেই এই শিক্ষা পর্য্যবসিত হইলে চলিবে না; শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবন-চরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শারীরতত্ত্ব শেখান প্রয়োজন।

৩। নিম্নলিখিত প্রকাশিত প্রাথমিক পুস্তকগুলি পাঠ্যরূপে গ্রহণযোগ্য :—

(ক) শিশুশিক্ষা (পাঁচ ভাগ)। প্রথম তিন ভাগে আছে—বর্ণপরিচয়, বানান এবং পঠম শিক্ষা। চতুর্থ ভাগ—জ্ঞানোদয়-সম্পাকিত একখানি ছোট বই। পঞ্চম ভাগ—'চেম্বার্স এডুকেশনাল্ কোর্স'-অন্তর্গত নৈতিক-পাঠ পুস্তকের ভাবানুবাদ।

(খ) পশ্বাবলী, অর্থাৎ জীবজন্তর প্রাকৃতিক বিবরণী।

(গ) বাংলার ইতিহাস—মার্শম্যানের গ্রন্থের ভাবানুবাদ।

(ঘ) চারুপাঠ বা প্রয়োজনীয় এবং চিত্তাকর্ষক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে পাঠমালা।

(ঙ) জীবনচরিত—'চেম্বার্স এক্সেম্‌প্ল্যারি বায়োগ্রাফি'-অন্তর্গত কোপার্নিকস্, গ্যালিলিও, নিউটন, সার্ উইলিয়ম হর্শেল, গ্রোশস, লিনিয়স, ডুবাল, সার্ উইলিয়ম জোন্স ও টমাস জেঙ্কিন্সের জীবনবৃত্তের ভাবানুবাদ।

৪। পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা এবং নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী রচিত হইতেছে। ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, শারীরতত্ত্ব, ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ এবং কতকগুলি ধারাবাহিক জীবনচরিত এখনও রচনা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস হইলেই চলিবে।

৫। এক জন শিক্ষক হইলে চলিবে না; প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্ততঃ দুই জন করিয়া শিক্ষক চাই। স্কুলগুলিতে সম্ভবতঃ তিনটি হইতে পাঁচটি

করিয়া শ্রেণী থাকিবে ; কাজেই এক জন শিক্ষকের দ্বারা স্কুলের কাজ চলিবে না।

৬। গুণ এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে পণ্ডিতদের মাহিনা মূলপক্ষে ৩০৲, ২৫৲ অথবা ২০৲ টাকা হওয়া চাই। পূর্ব্বকথিত পুস্তকগুলি যখন রচিত হইয়া পাঠের জন্য গৃহীত হইবে, তখন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে এক জন হেড-পণ্ডিত রাখার প্রয়োজন হইবে।

৭। শিক্ষকেরা কোথাও না গিয়া নিজেদের নির্দ্দিষ্ট স্থানেই যাহাতে যথানিয়মে বেতন পান, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। হুগলী, নদীয়া, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর—এই চারিটি জেলা বর্ত্তমানে কাজের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে হইবে। উপস্থিত পঁচিশটি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। প্রয়োজনানুসারে জেলা চারিটির মধ্যে এইগুলি ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। নগর এবং গ্রামের এমন স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যেন তাহার নিকটে কোন ইংরেজী কলেজ বা স্কুল না থাকে। ইংরেজী কলেজ ও স্কুলের আশে পাশে বাংলা-শিক্ষা ঠিকভাবে আদৃত হয় না।

৯। কর্ম্মকুশল সুদক্ষ তত্ত্বাবধানের উপরও বটে, এবং কৃতবিদ্য ছাত্রদের উৎসাহদানের উপরও বটে, বাংলা-শিক্ষার সাফল্য বহুপরিমাণে নির্ভর করে। জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানোপার্জ্জন সাধারণ দেশবাসীর এখনও উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় নাই। এই কারণে, ছোট লাট হার্ডিঞ্জের প্রস্তাব—যাহা এত দিন চাপা ছিল—দৃঢ়ভাবে প্রযুক্ত হওয়া দরকার।

১০। তত্ত্বাবধানের নিম্নলিখিত উপায় বিশেষ কার্য্যকর এবং অল্পব্যয়সাধ্য হইবে।

১১। যাতায়াতের ব্যয়সুদ্ধ, মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে দুই জন বাঙালী তত্ত্বাবধারক রাখা প্রয়োজন ;—এক জন মেদিনীপুর ও হুগলীর জন্য, আর এক জন নদীয়া ও বর্দ্ধমানের জন্য। তাহাদের কাজ হইবে—

মত মত স্কুলগুলি পরিদর্শন করা, শ্রেণীগুলির পরীক্ষা লওয়া, এবং শিক্ষা-প্রণালী সংশোধন করা।

১২। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইবেন। ইহার জন্ত তাঁহাকে অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক দিতে হইবে না; কেবলমাত্র যাতায়াতের খরচা দিলেই চলিবে। এই বাবদ বৎসরে ৩০০্ টাকার বেশী ব্যয় হইবে না। তিনি বৎসরে একবার স্কুলগুলি পরিদর্শন করিয়া কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দিবেন। কর্তৃপক্ষের উপরই বাংলা স্কুলগুলির পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকিবে।

১৩। গ্রন্থ-প্রণয়ন, এবং পুস্তক ও শিক্ষক নির্ব্বাচনের ভার প্রধান তত্ত্বাবধায়কের উপর থাকিবে।

১৪। সংস্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার এক কেন্দ্রভূমি হইয়াও বাংলা শিক্ষক গড়িবার জন্ত নর্মাল স্কুলরূপে পরিগণিত হইবে।

১৫। এমনি ভাবে শিক্ষকদের শিক্ষাদান, পাঠ্য পুস্তক রচনা ও গ্রহণ, শিক্ষক-নির্ব্বাচন, এবং সাধারণ তত্ত্বাবধানের ভার একই পদে যুক্ত হইলে, অনেক অসুবিধা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।

১৬। মাসিক এক শত টাকা বেতনে, প্রধান তত্ত্বাবধায়কের এক জন সহকারী নিযুক্ত করিতে হইবে। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে শিক্ষক-তৈয়ারী ও পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নে সাহায্য করিবেন এবং প্রধান তত্ত্বধায়ক বাংলা স্কুল-পরিদর্শনে বাহির হইলে তাঁহার স্থানে অস্থায়ি-ভাবে কাজ চালাইবেন।

১৭। গুরুমহাশয়-চালিত এখনকার পাঠশালাগুলি কোন কাজেরই নয়। যে-কাজে তাহারা অযোগ্য, এই সকল শিক্ষক সেই কাজ হাতে লওয়াতে পাঠশালাগুলির অবস্থা শোচনীয়। তত্ত্বাবধায়কদের কাজ হইবে—এই সকল পাঠশালা পরিদর্শন করা এবং শিক্ষাদানের রীতি সম্বন্ধে গুরুমহাশয়দের যথাসাধ্য উপদেশ দেওয়া। পূর্ব্বোল্লিখিত পাঠ্য পুস্তকগুলি

সুযোগ-মত যথাসাধ্য প্রবর্তন করাও তাঁহাদের কর্তব্যের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে পাঠশালাগুলি যাহাতে প্রয়োজনসাধক বিদ্যালয়রূপে গড়িয়া উঠে, সেদিকে তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১৮। দেশীয় লোক অথবা মিশনরী কর্তৃক স্থাপিত যে-সব স্কুল সুদক্ষ শিক্ষকের হাতে আছে, অবশ্য তাহাদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়কেরা এই সকল বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া কি রকম উৎসাহ ও সাহায্য তাহারা পাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন।

১৯। নিজের নিজের এলাকার অন্তর্গত, শহর ও পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগকে গবর্মেণ্ট স্কুলের আদর্শে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিতে প্ররোচিত করাও তত্ত্বাবধায়কদের এক কর্তব্য হইবে।—৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪।

হালিডে ব্যয়বাহুল্য বর্জ্জন করিবার ইচ্ছায় ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানের সমর্থন করেন নাই। তিনি মিনিটে লিখিয়াছিলেন,—

জানি, মাথার উপর কোন ইউরোপীয় না থাকিলে দেশীয় তত্ত্বাবধায়কদের বেশী বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কিন্তু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা এক জন অসাধারণ লোক, তিনি এ-বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরীক্ষার ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দেখিলে আমি আনন্দিত হইব। পরীক্ষার ফল কি হয়, তাহা দেখিতে তিনি অত্যন্ত উৎসুক এবং আমি সত্যই মনে করি, ইহাতে তিনি সফল হইবেন।

কিন্তু শিক্ষা-পরিষদের সদস্যদের অনেকেই—রামগোপাল ঘোষ, সার্ জেম্‌স কোল্‌ভিল প্রভৃতি—এ প্রস্তাবের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের এতটুকু সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদের গুরু ভারের কথা স্মরণ করিয়া বিদ্যাসাগরকে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক করিবার প্রস্তাবে তাঁহারা সম্মতি দেন

নাই। সংস্কৃত কলেজ হইতে তাঁহাকে ছাড়িতে না-চাহিলেও তাহারা স্থির করেন যে, "এই মহিৎ আন্দোলনের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের কোন-না-কোনরূপ যোগ থাকা উচিত। পুস্তক, শিক্ষক এবং স্থানের নির্ব্বাচন, শিক্ষা-প্রণালী ও অপরাপর নানা বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ খুবই মূল্যবান্ হইবে।" কিন্তু হ্যালিডে যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেন, কোন বাধাই তাঁহাকে সে-কাজে বিচলিত করিতে পারিত না। ইহার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে।

বিদ্যাসাগরের শক্তি সম্বন্ধে হ্যালিডের একটা শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধা হইতে বন্ধুত্বের উৎপত্তি হয়। অনেক সময় তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া শিক্ষা-সম্পর্কীয় নানা বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতেন। বাংলার ছোট লাটের আসনে বসিবার পরই, হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের উপর প্রস্তাবিত মডেল বঙ্গবিদ্যালয়গুলির স্থান-নির্ব্বাচনের ভার দিলেন। এই কাজের জন্য তাঁহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। ৩ জুলাই ১৮৫৪ তারিখে ছোট লাটকে তিনি যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে দেখা যায়, তিনি ২১এ মে হইতে ১১ই জুন পর্য্যন্ত, সংস্কৃত কলেজের ছুটির সময়, হুগলী জেলার শিয়াখালা, রাধানগর, কৃষ্ণনগর, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, শ্রীপুর, কামারপুকুর, রামজীবনপুর, মায়াপুর, মলয়পুর, কেশবপুর, পাতিহাল পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। এই সকল গ্রামের অধিবাসীরা স্কুল-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিল, এমন কি, তাহারা নিজ খরচায় স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। সংস্কৃত কলেজের ছুটি ফুরাইয়া আসায় বিদ্যাসাগর হুগলী জেলার অন্যান্য স্থান, অথবা নদীয়া, বর্দ্ধমান ও ২৪-পরগণায় যাইতে পারেন নাই। যাইতে না পারিলেও, স্কুল-প্রতিষ্ঠার উপযোগী গ্রামগুলির সম্বন্ধে তিনি নানারূপ সংবাদ আহরণ

করিয়াছিলেন। পত্রের শেষে তিনি লিখিতেছেন,—"বিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য যেমনই অনুমতি পাওয়া যাইবে, স্কুল-ঘর তৈয়ারী করিবার জন্য দু-তিন মাস অপেক্ষা না করিয়া, আমার নির্ব্বাচিত স্থানগুলিতে অমনই যেন স্কুল খোলা হয়।"*

বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা শেষে বুঝিতে পারিলেন, ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত বটে। ১৯ জুলাই ১৮৫৪ তারিখে বোর্ড অফ কন্‌ট্রোলের সভাপতি, সার্ চার্লস্ উড, 'ভারতের শিক্ষা-বিষয়ক চার্টার' নামে পরিচিত বিখ্যাত পত্রখানি স্বাক্ষর করিলেন। পর-বৎসর জানুয়ারি মাসে বাংলায় কাজ আরম্ভ হইল; শিক্ষা-পরিষদের বদলে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন বাহাল হইলেন। কিছু দিন পরেই কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করিবার উপায়-নির্দ্ধারণার্থে এক ইউনিভার্সিটি কমিটি গঠিত হইল। বিদ্যাসাগর এই কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে বিদ্যাসাগর ইহার 'ফেলো' মনোনীত হন।†

হ্যালিডের মিনিটে প্রাথমিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণের পত্রে তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যবস্থার নির্দ্দেশ ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার দিকে বড় লাটের ঝোঁক থাকায় তিনি প্রথমে কয়েকটি জেলা লইয়া কাজ আরম্ভ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। যদি সংস্কৃত কলেজের কাজের কোন ক্ষতি না হয়, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে মডেল বঙ্গবিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের জন্য বাহির হইতে পারেন, এ-সম্বন্ধে বড় লাটের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু

* Letter to Pandit Ishwarchandra Sharma, dated 26 January, 1855.—*Public Con. 26 Jany. 1855*, No. 154, also No. 158.

† *Public Procdgs. 18 Decr. 1856*, p. 7.

বিলাতের পত্র অনুসারে তাঁহাকে বাংলা-শিক্ষা-ব্যবস্থার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট করা হইল না;—এ কার্য্য ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন এবং তদধীন ইন্‌স্পেক্টরের দ্বারা চালিত হইবে।*

ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন নিযুক্ত হইলেন। তবু হ্যালিডে অনুভব করিতে লাগিলেন, যদি বঙ্গদেশে বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থা সফল করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে বিদ্যাসাগরের মত লোকের সাহায্য ব্যতীত সে কার্য্য অসম্ভব। ডিরেক্টরকে লিখিত বাংলা-গবর্মেণ্টের পত্রে প্রকাশ :—

> শিক্ষা-বিভাগের নূতন ব্যবস্থাসত্ত্বেও, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত বিশিষ্টরূপ গুণবান্ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা শ্রেয়স্কর, ইহাই ছোট লাটের মত। অধ্যক্ষ-হিসাবে সংস্কৃত কলেজের কর্ত্তব্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধ না হয়, অথচ এ কাজে তাঁহার প্রয়োজনীয় সাহায্য কি করিয়া পাওয়া যায়, সে-সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ঠিক করিতে ছোট লাট অনুরোধ করিতেছেন। (২৩ মার্চ ১৮৫৫)

উত্তরে ডিরেক্টর প্রস্তাব করিলেন, স্থায়ী কর্ম্মচারী—মিঃ প্র্যাটকে না-পাওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরকে অস্থায়িভাবে ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুলের কাজে লাগান যাইতে পারে। এ প্রস্তাব কিন্তু ছোট লাটের মনঃপূত হইল না। তিনি মিনিটে লিখিলেন—

> অস্থায়িভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে নিযুক্ত করিয়া কোনই লাভ নাই। ঈশ্বরচন্দ্র দৃঢ়চিত্ত লোক। বাংলা-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি জোরালো মতামত আছে। যদি তাঁহার মতলব অনুযায়ী কাজ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই উৎসাহ ও বিচার-বুদ্ধি সহকারে

* Letter from C. Beadon, Secy. to the Govt. of India, to W. Grey, Secy. to the Govt. of Bengal, dated 18 Feb. 1855.

মজুরী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সফল করিয়া তুলিবার কার্য্যে লাগিয়া যাইবেন। তিন মাসে হউক আর তিন সপ্তাহে হউক, মিঃ প্র্যাট্ যেমনই আসিবেন, অমনই সরিয়া যাইতে হইবে, এইরূপ অস্থায়িভাবে যদি তাঁহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তবে তিনি যে কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন, এমন আমার বোধ হয় না।

আমার নির্দ্ধারিত যে বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থা ভারত-গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে, তাহাতে তিন-চারিটি জেলার উল্লেখ আছে। সেই জেলাগুলিতে শিক্ষা-ব্যবস্থা কাজে পরিণত করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট বেতনে প্রতিনিধি-সাব-ইনস্পেক্টররূপে ঈশ্বরচন্দ্রকে যদি নিযুক্ত করা যায়, তাহাতে আমি কোন আপত্তির কারণ দেখি না। ইহাতে মিঃ প্র্যাটের কাজে বাধা পড়িবে বলিয়া বোধ হয় না। ঈশ্বরচন্দ্রের কার্য্যের পরিদর্শন ছাড়াও, যে-সব জেলা তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র, সেই সব স্থানে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী ও ইঙ্গ-বঙ্গ স্কুল ও কলেজসমূহের ইন্‌স্পেক্টর হিসাবে তাঁহার করিবার কাজ যথেষ্টই থাকিবে।

বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থা অতি গুরুতর বিষয়। বহু কষ্ট স্বীকার এবং যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া যাহা ঠিক করিয়াছি, সেই ব্যবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা ফলদায়ক বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের এক জন প্রধান উদ্যোগীকে যদি এমন কাজে নিযুক্ত করা হয়, যাহাতে নানা ভাবে প্রতিহত হইবার আশঙ্কা আছে, এবং তাঁহাকে ভুল পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যদি সেই ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করিবার দিকে লইয়া যাওয়া হয়, তবে সত্যই তাহা দুঃখের কথা। (১১ এপ্রিল ১৮৫৫)

২০ এপ্রিল ১৮৫৫ তারিখে বাংলা-সরকার ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শনকে এই সুরে পত্র লিখিলেন,—

ছোট লাট পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের মত বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোককে ঐরূপ একটা অস্থায়ী পদে নিযুক্ত করিবার বিরোধী। অতি অল্প দিনের কাজে

পণ্ডিত কোন কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। এরূপ নিয়োগ তাঁহার চরিত্র ও গুণের যোগ্য হইবে না। যে-কোন মুহূর্ত্তে বিদায় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে—এমন অস্থায়ী ব্যবস্থা করিলে পণ্ডিতের প্রতি সরকারের অবিচার হইবে।

ছোট লাটের মত এই, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মাকে এখনই অনুমোদিত ব্যবস্থা-অনুসারে কাজ করিতে নির্দ্দেশ করা হউক। পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিয়া, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী তিন-চারিটি জেলা কর্ম্মক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লওয়া হউক। ইহাতে—অন্ততঃ এই সময়টায়—পণ্ডিতের কলেজের কাজে বিশেষ বাধা জন্মিবে না।...সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে বেতন ছাড়া, পণ্ডিত এই কাজ করিবার কালে মাসিক দুই শত টাকা এবং যাতায়াতের পথ-খরচা পাইবেন।

ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন তখনই বিদ্যাসাগরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের পরামর্শ করিলেন। তাঁহাকে দক্ষিণ-বাংলার বিদ্যালয়সমূহের সহকারী ইন্‌স্পেক্টর-পদে নিযুক্ত করা হইল; ১ মে ১৮৫৫ হইতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার উপর এই কাজে মাসে দুই শত টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। নিযুক্ত হইয়াই তিনি নিজের সাব-ইন্‌স্পেক্টর* বাছিয়া লইলেন, এবং মডেল স্কুল স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে মফস্বলে পাঠাইলেন। প্রস্তাবিত নূতন বাংলা বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-নির্ব্বাচনই হইল তাঁহার প্রথম কাজ। তিনি জানিতেন, এই সব শিক্ষকের উপযুক্তরূপ জ্ঞানের উপরই সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার সাফল্য

* হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং বিদ্যাসাগরের [illegible] দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। ইঁহাদের বেতন ছিল—পথ-খরচা ছাড়া মাসিক এক শত টাকা।

নির্ভর করিতেছে। সংস্কৃত কলেজে বাংলা শিক্ষক নির্ব্বাচনের একটি পরীক্ষা গৃহীত হইবে বলিয়া তিনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে নোটিস বাহির করিলেন। নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে দুই শতেরও অধিক পদপ্রার্থী পরীক্ষা দিয়াছিল। দেখা গেল, আর কিছু শিক্ষা না পাইলে তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই সরকারী মডেল স্কুলগুলির ভার লইতে সমর্থ হইবে। এমনই করিয়া শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য একটি নর্মাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হইল। 'পাঠশালা' নামে একটি বাংলা স্কুল পূর্ব্বে হিন্দু-কলেজের সহিত সংযুক্ত ছিল। এই সম্পর্কে সেটি যাহাতে তাঁহার তত্ত্বাবধানে আসে, বিদ্যাসাগরের অভিপ্রায় ছিল তাহাই। তিনি ডিরেক্টরকে বলিলেন, প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ কাজে লাগিবে। যাহারা মফস্বল বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক হইতে চায়, তাহারা 'পাঠশালা'র শিখাইবার ও পরিচালন করিবার পদ্ধতি দেখিয়া, কখনও কখনও নিজেরাও পড়াইয়া, শিক্ষকতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতে পারে। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিলে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ মডেল স্কুলে পরিণত করা যাইতে পারে। ডিরেক্টরকে লিখিত ২ জুলাই ১৮৫৫ তারিখের পত্রে বিদ্যাসাগর নর্মাল স্কুল-স্থাপনে তাঁহার উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই চিঠিতে অক্ষয়কুমার দত্ত সম্বন্ধে লেখা আছে :—

> তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সর্ব্বজনবিদিত সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত নর্মাল ক্লাসগুলির প্রধান শিক্ষক হন—ইহাই আমার অভিমত। বর্ত্তমানে প্রথম শ্রেণীর বাংলা লেখক অতি অল্পই আছেন; অক্ষয়কুমার সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখকদের অন্যতম। ইংরেজীতে তাঁহার বেশ জ্ঞান আছে, এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যসমূহ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ; শিক্ষকতা-কার্য্যেও তিনি পটু। মোট কথা, তাঁহার অপেক্ষা

যোগ্যতর লোক পাইবার সম্ভাবনা নাই।…দ্বিতীয় শিক্ষক হিসাবে আমি পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির নাম উল্লেখ করি।'

বাংলা-স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব সর্ব্বত্রই অনুভূত হইতেছিল। বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট এবং ডিরেক্টর উভয়েই পণ্ডিতের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। ছয় মাস অন্তর ৬০ জন করিয়া গুণী শিক্ষক স্কুল হইতে বাহির হইবে; তুলনায় মাসিক পাঁচ শত টাকা ব্যয় কিছুই নয়। ১৭ জুলাই ১৮৫৫ তারিখে বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে একটি নর্মাল স্কুল খোলা হইল।

স্বতন্ত্র বাড়ী না পাওয়ায় নর্মাল স্কুল সকালবেলা দুই ঘণ্টার জন্য সংস্কৃত কলেজেই বসিত। স্কুলটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; উচ্চ শ্রেণীর ভার—প্রধান শিক্ষক সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্তের উপর, এবং নিম্ন শ্রেণীর ভার—দ্বিতীয় শিক্ষক মধুসূদন বাচস্পতির উপর ছিল। ৭১টি ছাত্র লইয়া প্রথম স্কুল খোলা হয়; তন্মধ্যে ৬০ জনকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইত। ১৭ বছরের কম, অথবা ৪৫ বছরের বেশী বয়সী ছাত্রদের ভর্ত্তি করা হইত না। প্রথম প্রথম কেবল উচ্চবর্ণের লোককেই লওয়া হইত। 'বোধোদয়', 'নীতিবোধ', 'শকুন্তলা', 'কাদম্বরী', 'চারুপাঠ' ও 'বাহ্যবস্তু' পড়ান হইত। ভূগোল, পদার্থবিদ্যা ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধেও পাঠ দেওয়া হইত। মাসে মাসে পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা ছিল। অমনোযোগী ছাত্রেরা বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত, এবং পাঠে অগ্রসর ছাত্রেরা শিক্ষকরূপে নির্ব্বাচিত হইত।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মধ্যেই বিদ্যাসাগর তাঁহার এলাকার প্রত্যেক জেলায় পাঁচটি করিয়া স্কুল স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়-পিছু মাসে ৫০৲ টাকা করিয়া খরচ পড়িত। বিদ্যালয়-গৃহ গ্রামবাসীর ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ডিরেক্টর অফ

পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশনের নির্দ্দেশ ছিল, ছয় মাস পর্য্যন্ত ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইবে না, তাহার পর কিন্তু সতর্ক হইয়ে মাহিনা আদায় করা হইবে।

অক্লান্তকর্ম্মা ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, নর্ম্মাল স্কুল, চারি জেলার মডেল স্কুল ও বাংলা পাঠশালার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি যে-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ভারত-সরকারের নির্দ্দেশে, পূর্ব্বতন নাম বদলাইয়া সে পদের নাম হইল—দক্ষিণ-বাংলার বিদ্যালয়সমূহের স্পেশ্যাল ইন্‌স্পেক্টর।

সার্ হেনরি হার্ডিঞ্জের স্থাপিত স্কুলগুলি সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহা দেখিয়াও বিদ্যাসাগর দমিলেন না। তিনি মডেল স্কুল-গুলিকে সার্থক করিবার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নেও তিনি লাগিয়া গেলেন। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম সুফলপ্রসূ না হইয়া পারে না। কার্য্য-সূচনার তিন বৎসর পরে তিনি যে রিপোর্ট লিখিলেন, তাহাতে সফলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

> প্রায় তিন বৎসর হইল মডেল বঙ্গবিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই স্কুলগুলি সন্তোষজনক উন্নতিলাভ করিয়াছে। ছাত্রগণ সকল বাংলা পাঠ্য পুস্তকই পাঠ করিয়াছে। ভাষার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ দখলের পরিচয় পাওয়া যায়; প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়েও তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছে।
>
> গোড়ায় অনেকে সন্দেহ করিয়াছিল, মফস্বলের লোকেরা মডেল স্কুলগুলির মর্ম্ম বুঝিবে না। প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ণ সার্থকতা এই সন্দেহ দূর করিয়াছে। যে যে স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত, সেই সব গ্রামের এবং তাহাদের আশপাশের পল্লীবাসীরা এই বিদ্যালয়গুলি অতি উপকারী বলিয়া মনে করে; ইহার জন্য সরকারের কাছে তাহারা কৃতজ্ঞ। স্কুলগুলির যে যথেষ্ট আদর হইয়াছে, ছাত্র-সংখ্যাই তাহার প্রমাণ।

বিদ্যাসাগর বিভিন্ন জেলায় যে-সকল মডেল স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

নদীয়া

বেলঘোরিয়া	মডেল স্কুল	প্রতিষ্ঠাকাল	...	২২	আগষ্ট	১৮৫৫
মহেশপুর	ঐ		...	১	সেপ্টেম্বর	"
ভজনঘাট	ঐ		...	৪	ঐ	"
কুশদহ বা থাটুরা	ঐ		...	১১	ঐ	"
দেবগ্রাম	ঐ		...	১২	ঐ	"

বর্দ্ধমান

আমাদপুর	মডেল স্কুল	...	২৬	আগষ্ট	১৮৫৫
জৌগ্রাম	ঐ	...	২৭	ঐ	"
খণ্ডঘোষ	ঐ	...	১	সেপ্টেম্বর	"
মানকর	ঐ	...	৩	ঐ	"
দাঁইহাট	ঐ	...	২৯	অক্টোবর	"

হুগলী

হারোপ	মডেল স্কুল	...	২৮	আগষ্ট	১৮৫৫
শিয়াখালা	ঐ	...	১৩	সেপ্টেম্বর	"
কৃষ্ণনগর	ঐ	...	২৮	ঐ	"
কামারপুকুর	ঐ	...	২৮	ঐ	"
ক্ষীরপাই	ঐ	...	১	নবেম্বর	"

মেদিনীপুর

গোপালনগর	মডেল স্কুল	...	১ অক্টোবর ১৮৫৫
বাসুদেবপুর	ঐ	...	১ ঐ "
মালঞ্চ	ঐ	...	১ নবেম্বর "
প্রতাপপুর	ঐ	...	১৭ ডিসেম্বর "
জকপুর	ঐ	...	১৪ জানুয়ারি ১৮৫৬

বিদ্যাসাগরের যত্ন চেষ্টায় অনেকগুলি বিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পাইকপাড়া রাজাদের প্রতিষ্ঠিত (১ এপ্রিল ১৮৫৯) কাঁদির ইংরেজী-সংস্কৃত স্কুল তাহাদের অন্যতম। কিছু দিন তিনি ইহার অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন। মেদিনীপুর ঘাটাল অঞ্চলে "এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার পাঠোপযোগী এক সংস্কৃত সহিত ইংরেজী স্কুল" প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে দুই জন স্থানীয় ভদ্রলোক আর্থিক সাহায্যের জন্য তাঁহাকে লিখিলে তিনি অবিলম্বে তাঁহাদের জানাইয়াছিলেন,—"আপনাদিগের উদ্যোগে ঘাটালে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে উহার গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনাটন আছে আমি স্বতঃপরতঃ তাহা সমাধা করিয়া দিব সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন, তজ্জন্য অন্য চেষ্টা দেখিবার আর প্রয়োজন নাই" (৬ জুলাই ১৮৬৮)। স্বগ্রামে তিনি বালকদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন (১৮৫৩)। দক্ষিণ-বাংলার স্কুল-সমূহের ইন্‌স্পেক্টর লজ সাহেব বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন :—

> বীরসিংহ বিদ্যালয় :—এই স্কুলটি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহারই সম্পূর্ণ ব্যয়ে পরিচালিত। এ কথা না বলিলে

এই সুবিখ্যাত জনহিতৈষীর প্রতি অবিচার করা হয়; স্কুল-গৃহের জন্ত তিনি বেশ উপযোগী স্থানে একখানি সুন্দর বাংলা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ছয়-সাত জন শিক্ষকের বেতন তিনি নিজেই দেন। ছাত্রদের নিকট মাহিনা লওয়া হয় না, বিনামূল্যে তাহাদের সকল রকম বই দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, পণ্ডিতের নিজের বাড়ীতে প্রায় ৩০ জন দরিদ্র ছেলের আহারের ও থাকিবার ব্যবস্থা আছে; দরকার পড়িলে বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত যোগান হয়। অসুখে তাঁহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়; সকলের সম্বন্ধেই এমন যত্ন লওয়া হয় যেন প্রত্যেকেই পরিবারের এক জন।

এখানে সংস্কৃতই প্রধান পাঠ্য। উচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজী এবং নিম্ন শ্রেণীতে বাংলাও পড়ান হয়। স্কুলে আটটি শ্রেণী আছে। ছাত্র-সংখ্যা ১৬০। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা ইংরেজীতে ভালই পরীক্ষা দিয়াছিল, তবে তাহাদের উচ্চারণ শুদ্ধ নয়।

বাংলা সম্বন্ধে ছেলেরা বিশেষ মনোযোগ দেয় না। বাংলায় লেখা বিজ্ঞানের বই চালাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছি। ছেলেরা সংস্কৃত ভালই জানে। (২০ মে ১৮৫৯)

শেষ-জীবনে বিদ্যাসাগর শহরের কর্ম্মকোলাহল হইতে মাঝে মাঝে মধুপুরের নিকট কার্ম্মাটারের নির্জ্জন সাঁওতাল-পল্লীতে আসিয়া বাস করিতেন। কার্ম্মাটার স্টেশনের ধারেই বাগান সমেত তাঁহার বাংলাখানির ধ্বংসাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিবেশী অসভ্য সাঁওতালদের তিনি এতই ভালবাসিতেন যে, তাহাদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য নিজব্যয়ে এখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহার মাসিক কুড়ি টাকা ব্যয় হইত।

স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার সরকার নিজের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। ইতিপূর্ব্বেই কিন্তু রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কয়েক জন সম্ভ্রান্ত মহোদয় এবং খ্রীষ্টান মিশনরীগণ স্ত্রীশিক্ষার কিছু সূচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৭ মে ১৮৪৯ তারিখে কলিকাতায় ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন কর্ত্তৃক একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি তখন হইতেই যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল—হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়; পরে 'বীটন নারী বিদ্যালয়'—এই নূতন নামকরণ হয়। গোড়া হইতেই বিদ্যাসাগরকে সহকর্ম্মী এবং উৎসাহী বন্ধুরূপে পাইবার সৌভাগ্য বীটন সাহেবের ঘটিয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদের সভাপতিরূপে বীটন বিদ্যাসাগরের সহিত প্রথম পরিচিত হন। ঈশ্বরচন্দ্রকে এক জন অক্লান্তকর্ম্মী গুণী ব্যক্তি বলিয়াই তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল, তাই তিনি বিদ্যাসাগরকেই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকরূপে কাজ করিবার জন্য ধরিলেন (ডিসেম্বর, ১৮৫০)। আচারবদ্ধ দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের বালিকাদের গাড়ীর দুই পাশে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—মনুসংহিতার এই শ্লোকাংশ খোদিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিছু দিন পরেই বীটন পরলোকগত হন (১২ আগস্ট ১৮৫১)। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাস হইতে লর্ড ড্যালহাউসি বিদ্যালয়-পরিচালনার সমস্ত খরচ বহন করিতে লাগিলেন। লাট সাহেবের বিদায়গ্রহণের (মার্চ ১৮৫৬) পর হইতে ইহা সরকারী-ব্যয়ে-পরিচালিত সরকারী

বিদ্যালয়ে পরিণত হইল, এবং বঙ্গের ছোট লাট ইহাকে সিসিল বীডনের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত করিলেন। ১২ আগস্ট ১৮৫৬ তারিখের পত্রে বীডন সাহেব বাংলা-সরকার সমীপে এক ব্যবস্থা পেশ করিলেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি যাহাতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের নজরে বিশেষ করিয়া পড়ে, এবং তাঁহারা যাহাতে এই বালিকা-বিদ্যালয়ে কন্যাদের পড়াইতে প্ররোচিত হন, এইরূপ ব্যবস্থার প্রস্তাব সেই পত্রে ছিল। একটি কমিটি করিবার প্রস্তাবও পত্রে ছিল। কমিটির সদস্যরূপে রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমাপ্রসাদ রায় এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হয়। বিদ্যাসাগরকে সম্পাদক করিয়া তাঁহার উপর স্কুলের তত্ত্বাবধানের ভার দিবার জন্য বীডন ব্যগ্র হইলেন। তিনি ছোট লাটকে লিখিলেন:—"কমিটি সম্পাদক-নিয়োগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মাকেই উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহার সামাজিক সম্মান ও স্কুলের সম্পাদক হিসাবে পূর্ব্বপরিশ্রম তাঁহার যোগ্যতা সপ্রমাণ করে।"

বাংলা-সরকার সম্মত হইলেন। বীডন সাহেব কমিটির সভাপতি ও বিদ্যাসাগর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের মত বিদ্যাসাগরও স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন; তিনিও মনে করিতেন, স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন দেশের উন্নতি নাই। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ ও কর্ম্মিষ্ঠতা শুধু বীটন স্কুলের কাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত পত্রে ও অন্যত্র বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার এক সমস্যা। সেই সমস্যা-সমাধানের উপায় বহুল পরিমাণে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের

গোড়ার দিকে বাংলা দেশে হ্যালিডে সাহেব সেই কাজে হাত দিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে ডাকাইয়া, তাঁহার সহিত এ-সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিলেন। কাজ যে কত কঠিন, সে কথা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। সাধারণ বালিকা-বিদ্যালয়ে নিজেদের মেয়ে পাঠাইতে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মনে কতটা যে অনিচ্ছা আছে, তাহা তাঁহারা ভালরূপেই বুঝিতেন। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কাজে লাগিলে এরূপ সৎকার্য্যে জনগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা খুব কঠিন হইবে না।

বিদ্যাসাগর অল্প দিনের মধ্যেই জানাইলেন, বর্দ্ধমান জেলার জৌগ্রামে তিনি একটি বালিকা-বিদ্যালয় খুলিতে পারিয়াছেন (৩০ মে ১৮৫৭)। ডিরেক্টর প্রতিষ্ঠানটির জন্য সরকারের কাছে ৩২৲ টাকা মাসিক সাহায্যের অনুমোদন করিয়া পত্র লিখিলেন।

দক্ষিণ-বঙ্গের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর প্র্যাট সাহেবের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য তিনখানি আবেদন-পত্র আসিয়াছিল। ডিরেক্টর সেগুলি পূর্ব্বেই সরকারের দপ্তরে পেশ করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার হরিপাল থানার অন্তর্গত দোয়ারহাটা ও বৈদ্যবাটী থানার অন্তর্গত গোপালনগর, এবং বর্দ্ধমানের নারোগ্রামে তিনটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সেই তিনখানি আবেদন-পত্রে ছিল। ছোট লাট সকল দরখাস্তই মঞ্জুর করিলেন; প্রত্যেক স্থলেই পল্লীবাসীরা বিদ্যালয়-বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিবার ভার লইল। সাহায্য মঞ্জুর করিবার সময় ছোট লাট জানিতে চাহিলেন, বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টরদের নিকট হইতে ডিরেক্টর আর কোন আবেদন পাইয়াছেন কি না, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রার্থনাও তিনি পূর্ণ করিবেন।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা-সরকারের ভাব বিদ্যাসাগরের কাছে ভাল

বলিয়াই মনে হইল। তিনি পূর্ব্বেই বালকদের জন্ত মডেল বাংলা বিভালয়গুলি কার্য্যকর ও সুশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইবার বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি ফিরাইলেন। মডেল বাংলা বিদ্যালয়-সম্পর্কে তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই করিলেন। তিনি ধরিয়া লইলেন, সরকার তাঁহার মতলব সাধারণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। এই ধারণার বশে তিনি নিজ এলাকাভুক্ত জেলাসমূহে অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সব বিদ্যালয়-স্থাপনার সংবাদ তিনি যথাসময়ে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাক্শনের কাছে পাঠাইয়া মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ডিরেক্টর পূর্ব্বেকার আদেশ অনুযায়ী অন্যান্য আবেদন-পত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পত্রগুলিও ছোট লাটের বিবেচনার্থ পাঠাইলেন।

নবেম্বর ১৮৫৭ হইতে মে ১৮৫৮—এই কয় মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসে ৮৪৫৲ টাকা খরচ হইত; ছাত্রী-সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০। এই সকল বালিকা-বিদ্যালয়ের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

গ্রাম	প্রতিষ্ঠাকাল	মাসিক খরচ
পোটবা	২৪ নবেম্বর ১৮৫৭	২৯৲
দাসপুর	২৬	২০৲
বঁইচি	১ ডিসেম্বর	৩২৲
দিগড়ুই	৭ "	৩২৲
তালাণ্ডু	৭ "	২০৲
হাড়িনা	১৫ "	২০৲
ক্ষুরো	১৫ "	২০৲

নপাড়া	৩০ জানুয়ারি ১৮৫৮	১৬৲
উদয়রাজপুর	২ মার্চ	২৫৲
রামজীবনপুর	১৬ "	২৫৲
আকাবপুর	২৮ "	২৫৲
শিয়াখালা	১ এপ্রিল	২০৲
মাহেশ	১ "	২৫৲
বীরসিংহ	১ "	২০৲
গোয়ালসারা	৪ "	২৫৲
মণ্ডীপুর	৫ "	২৫৲
দেপুর	১ মে	২৫৲
রাউজাপুর	১ "	২৫৲
মলয়পুর	১২ "	২৫৲
বিষ্ণুদাসপুর	১৫ "	২০৲

বর্দ্ধমান

রানাপাড়া	১ ডিসেম্বর ১৮৫৭	২০৲
জামুই	২৫ জানুয়ারি ১৮৫৮	৩০৲
শ্রীকৃষ্ণপুর	২৬ "	২৫৲
রাজারামপুর	২৬ "	২৫৲
জ্যোৎ-শ্রীরামপুর	২৭ "	২৫৲
দাঁইহাট	১ মার্চ	২০৲
কাশীপুর	১ "	২১৲
সাতুই	১৫ এপ্রিল	২৫৲
রসুলপুর	২৬ "	৩১৲
বস্তীর	২৭ "	২০৲
বেলগাছি	১ মে	২০৲

মেদিনীপুর

জাহানাবাদ	১ জানুয়ারি ১৮৫৮	৩০৲
বদনগঞ্জ	১০ মে	৩১৲
শান্তিপুর	১৫ "	২০৲

নদীয়া

নদীয়া	১ মে ১৮৫৮	২৮৲
		৮৪৫৲

১৩ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে বাংলার ছোট লাট ভারত-সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাইলেন,—পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে-সকল বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৬টি বিদ্যালয়ের সম্পর্কে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য দরখাস্ত আসিয়াছে। সরকারী-সাহায্যদান-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী আর একটু ঢিলা না হইলে তিনি দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন না। তিনি দেখাইলেন, ১ অক্টোবর ১৮৫৬ তারিখের পত্রে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ আশা দিয়া বলিয়াছেন যে, বালিকা-বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীদের নিকট হইতে মাহিনা লওয়া হইবে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ছোট লাট মনে করেন, আরও কিছু করা দরকার। তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন, যখনই বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য নি-খরচায় উপযুক্ত গৃহ এবং অন্ততঃ কুড়িটি ছাত্রী ভর্ত্তি হইবে এমন একটা আশা পাওয়া যাইবে, তখনই স্কুল-পরিচালনার সমস্ত খরচ সরকার সরবরাহ করিবেন।

৭ মে ১৮৫৮ তারিখের পত্রে ভারত-সরকার বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে সরকারী সাহায্যের নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম করিতে অস্বীকৃত

হইলেন ; বলিলেন, উপযুক্ত পরিমাণে স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য না পাওয়া গেলে এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই ভাল।

ভারত-সরকারের এইরূপ আদেশ বিদ্যাসাগরের কাজে বাধা জন্মাইল। সরকারের অনুমোদন পাওয়া যাইবেই, এই মনে করিয়া বিদ্যাসাগর অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য কথা ছিল, স্থানীয় অধিবাসীরাই উপযুক্ত বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে, আর সরকার অন্য সব খরচ যোগাইবেন। পণ্ডিত এখন বুঝিলেন, তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে, এত কষ্টের স্কুলগুলি অবিলম্বে উঠাইয়া দিতে হইবে। আর এক সমস্যা—শিক্ষকদের বেতন। প্রতিষ্ঠাবধি স্কুল হইতে তাঁহারা মাহিনা পান নাই। ৩০ জুন ১৮৫৮ তারিখ পর্য্যন্ত ধরিলে তাঁহাদের সকলের মোট পাওনা হয়—৩৪৩৯৶৫।

এই সম্পর্কে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে লেখা ঈশ্বরচন্দ্রের ২৪ জুন তারিখের পত্রখানি পড়িলে ব্যাপারটা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। বাংলায় পত্রখানির মর্ম্ম দেওয়া গেল :—

> হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুর জেলার অনেকগুলি গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। বিশ্বাস ছিল, সরকার হইতে মঞ্জুরী পাওয়া যাইবে। স্থানীয় অধিবাসীরা স্কুল-গৃহ তৈয়ারী করাইয়া দিলে সরকার খরচ-পত্র চালাইবেন। ভারত-সরকার কিন্তু ঐ সর্ত্তে সাহায্য করিতে নারাজ, কাজেই স্কুলগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষকবর্গ গোড়া হইতে মাহিনা পান নাই, তাঁহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দেওয়া দরকার। আশা করি, সরকার এই ব্যয় মঞ্জুর করিবেন।
>
> সরকারী আদেশ পাইবার পূর্ব্বেই, আমি অবশ্য স্কুলগুলি চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমে আপনি, অথবা বাংলা-সরকার এ বিষয়ে কোনরূপ অমত প্রকাশ করেন নাই; করিলে, এতগুলি

বিদ্যালয় খুলিয়া এখন আমাকে এমন বিপদে পড়িতে হইত না। স্কুলের কর্ম্মচারিবর্গ মাহিনার জন্য স্বভাবতই আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। যদি আমাকে নিজ হইতে এত টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে সত্যই আমার উপর অবিচার করা হইবে,—বিশেষতঃ খরচ যখন সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য করা হইয়াছে।

ডিরেক্টর বাংলা-সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের কথা জানাইয়া বলিলেন,—

> পণ্ডিতের পত্রের সহিত সংযুক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণীর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি; কেন-না, স্ত্রী-শিক্ষা-সম্পর্কে এই কর্ম্মচারীর স্বেচ্ছাবৃত এবং অনাড়ম্বর পরিশ্রমের কথা সরকারের না জানাই সম্ভব। দূরবর্ত্তী স্থানের অন্তবিধ কর্ত্তব্যের গুরু ভার যাঁহার উপর ন্যস্ত, কর্ত্তৃত্বের বিশেষ উচ্চ পদেও যিনি অবস্থিত নন, এমন এক ব্যক্তি কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীতও গ্রামসমূহে যদি এতটা করিয়া থাকিতে পারেন, সরকারের অনুমোদন ও সাহায্য পাইলে সেই দিকে কতটাই না তিনি করিতে পারিতেন? আর যদি আন্তরিক প্রচেষ্টাসত্ত্বেও ইহাতে সেই কর্ম্মচারীর অপমান ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে কি নিরুৎসাহের ভাবই না আসিয়া পড়িবে?

ছোট লাট ডিরেক্টরের অনুরোধ-পত্র সমর্থন করিয়া এবং "সংস্কৃত কলেজের অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও কৃতী অধ্যক্ষের আড়ম্বরহীন উৎসাহের" কথা উল্লেখ করিয়া ভারত-সরকারকে ব্যাপারটা পুনরায় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিলেন (২২ জুলাই ১৮৫৮)।

সরকার পণ্ডিতের উপর সুবিচার করেন নাই এবং সরকারের কাজে যে আর্থিক দায়িত্ব তিনি নিজে লইয়াছিলেন, সে দায়িত্ব তাঁহার ঘাড়েই পড়িয়াছিল, সরকার তাহা পরিশোধ করিতে অস্বীকৃত হন—এই গল্প বিদ্যাসাগরের জীবনী-লেখকগণই বানাইয়াছেন। ভারত-সরকারের

২২ ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখের পত্রে এ-সম্বন্ধে শেষ আদেশ প্রেরিত হয়। বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে বিদ্যাসাগর যে ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই টাকা যে সমস্তই পরিশোধ করা হইয়াছিল, এই পত্রই তাহার নিশ্চিত প্রমাণ। ভারত-সরকার লিখিতেছেন,—

দেখা যাইতেছে, পণ্ডিত আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই এ কাজ করিয়াছেন, এবং এ কাজ করিতে উচ্চতম কর্ম্মচারীদের উৎসাহ এবং সম্মতিও তিনি পাইয়াছেন। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া, এই বিদ্যালয়গুলিতে যে ৩৪৩৯৷৴৫ প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হইয়াছে, সেই টাকার দায় হইতে সপারিষদ বড় লাট তাঁহাকে মুক্ত করিতেছেন। সরকার এ টাকা দিবেন, ইহাই তাঁহার আদেশ।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলির, অথবা সেগুলির পরিবর্ত্তে প্রস্তাবিত সরকারী বিদ্যালয়গুলির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কোন স্থায়ী অর্থসাহায্য করিতে কাউন্সিলের সভাপতি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। সমস্ত চিঠিপত্র বিবেচনার্থ সেক্রেটরী অফ ষ্টেটের নিকট প্রেরিত হইবে। হুগলী, বর্দ্ধমান ও ২৪-পরগণায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনার জন্য অনধিক এক হাজার টাকার সাহায্যের জন্যও ইহাতে অনুরোধ থাকিবে। সেই টাকার কিয়দংশ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির সাহায্যার্থ এবং কিয়দংশ সরকার-সমর্থিত কতকগুলি মডেল স্কুলের জন্য ব্যয় করা হইবে।

কিন্তু বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ সিপাহী-বিদ্রোহের জন্য আর্থিক অনটনবশতঃ বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে কোন স্থায়ী সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন;—তবে আশা দিলেন, বিষয়টা ভবিষ্যতে বিবেচিত হইবে।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কীয় ব্যাপারে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনের সহিত মতান্তরই না-কি তাঁহার পদত্যাগের অন্যতম কারণ। মাসিক ৫০০৲ টাকার আয় হ্রাস,

সরকারের সাহায্যদানে অসম্মতি,—এ সব কিছুতেই তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে নিরাশ করিতে পারিল না। বালিকা-বিদ্যালয়গুলির পরিচালনের জন্য তিনি এক নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুলিলেন; ইহাতে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোক এবং উচ্চতন সরকারী কর্ম্মচারীরা নিয়মিত চাঁদা দিতেন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে তাঁহার প্রচেষ্টা যে দেশবাসীর আনুকূল্য লাভ করিয়াছে, তাহা সার্ বার্টল ফ্রিয়ারকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ :—

> শুনিয়া সুখী হইবেন, মফস্বলের যে-সকল বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য আপনি চাঁদা দিয়াছিলেন, সেগুলি ভালই চলিতেছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী জেলা-সমূহের লোকেরা স্ত্রীশিক্ষার সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে নূতন নূতন স্কুলও খোলা হইতেছে।

ছোট লাট বীডন সাহেবও মাসিক ৫৫৲ টাকা সাহায্য করিয়া পণ্ডিতকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

আগেই বলিয়াছি, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বিদ্যাসাগর বীটন-স্কুল-কমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি উক্ত কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তাঁহাকে নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হইত, কাজেই সময় তাঁহার বেশী ছিল না, তবুও বীটন-বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬২ তারিখে বিদ্যাসাগর বাংলা-সরকারকে বীটন-বিদ্যালয়-সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পাঠান। তাঁহার সম্পাদক থাকিবার কালে বিদ্যালয়ের অবস্থা কেমন ছিল, তাহার আভাস এই রিপোর্টে পাওয়া যায় :—

> পঠন ও লিখন, পাটীগণিত, জীবনচরিত, ভূগোল, বাংলার ইতিহাস, নানা বিষয়ে মৌখিক পাঠ, এবং সূচীকার্য্য শিক্ষণীয় বিষয়।

বাংলা-ভাষার মধ্য দিয়াই ছাত্রীগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। একজন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, দুই জন সহকারিণী এবং দুই জন পণ্ডিত—এই পাঁচ জন বিদ্যালয়ের শিক্ষক।...

কমিটির মত এই, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে...বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা দেখিয়া কমিটি বিশ্বাস করেন, যাহাদের উপকারের জন্য বিদ্যালয়টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজের সেই শ্রেণীর লোকের কাছে ইহা ক্রমেই সমাদর লাভ করিতেছে। বড়লোকেরা এখনও সাক্ষাৎভাবে বীটন-বিদ্যালয়ের সুবিধা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন নাই; এই শ্রেণী হইতে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রীই স্কুলে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অনেক সম্পন্ন-ঘরেই কিন্তু মহিলাদের জন্য গৃহশিক্ষার আয়োজন হইয়াছে,—ইহা দেখিয়া কমিটি আনন্দানুভব করিতেছেন। বিশেষ ভাবে বীটন-স্কুলের হিতকর প্রভাবই যে ইহার কারণ—ইহাই কমিটির বিশ্বাস।

মিস্ মেরী কার্পেণ্টারের নাম এদেশে মানব-হিতৈষী কর্ম্মী ও ভারত-বন্ধু বলিয়া সুপরিজ্ঞাত। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি তিনি কলিকাতায় আসেন। ভারতবর্ষে নারী-শিক্ষার প্রচার ছিল তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা। বিদ্যাসাগর যে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার কার্য্যে একজন বড় কর্ম্মী, এ কথা সুবিদিত। মিস্ কার্পেণ্টার কলিকাতা পৌঁছিয়াই পণ্ডিতের সহিত পরিচিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশন অ্যাটকিন্‌সন সাহেব বে-সরকারী পত্রে বিদ্যাসাগরকে জানাইলেন,—

প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়, মিস্ কার্পেণ্টারের নাম শুনিয়া থাকিবেন। তিনি আপনার সহিত পরিচিত হইতে, এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইতে ইচ্ছুক...। (২১ নবেম্বর ১৮৬৬)

ডিরেক্টর বীটন-বিদ্যালয়ে মিস্ কার্পেণ্টারের সহিত পণ্ডিতের পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রথম আলাপেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। তিনি বিদ্যাসাগরের সহিত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বালিকা-বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিলেন। ১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখে ডিরেক্টর অ্যাটকিন্‌সন, স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর উড্রো এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত মিস্ কার্পেণ্টার উত্তরপাড়া বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। ফিরিবার মুখে বিদ্যাসাগরের বগী-গাড়ী উল্টাইয়া যায়। তিনি পড়িয়া গিয়া যকৃতে গুরুতর আঘাত পান। এই দুর্ঘটনার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া যায়। যে সাঙ্ঘাতিক ব্যাধি শেষে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহাকে মৃত্যুপথে লইয়া যায়, এই দারুণ আঘাতই তাহার মূল কারণ। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই স্বাস্থ্যহানির দিকে মোটেই নজর দিলেন না,—প্রকৃত দেশহিতৈষীর ন্যায় দেশহিতের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

এক দল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আপাততঃ বীটন-বিদ্যালয়েই একটি নর্ম্যাল স্কুল স্থাপিত করিবার জন্য মিস্ কার্পেণ্টার আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এম. এম. ঘোষ প্রমুখ এদেশীয় জনকয়েক গণ্যমান্য লোক এই আন্দোলনের সপক্ষে ছিলেন। মিস্ কার্পেণ্টারের সহিত তাঁহার প্রস্তাবের ঔচিত্য বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য তাঁহাদের চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজে একটি সভার আয়োজন হয় (১ ডিসেম্বর ১৮৬৬)। বিদ্যাসাগরও ইহাতে আহূত হইয়াছিলেন। এই সভায় যে কমিটি গঠিত হয়, বিদ্যাসাগর তাহার এক জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। স্থির হয়, কমিটি প্রস্তাবিত নর্ম্যাল স্কুল স্থাপন বিষয়ে সরকারের নিকট আবেদন করিবেন। সভার কার্য্যাবলী

সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্যাসাগর কমিটিভুক্ত থাকিতে অস্বীকার করেন; তিনি লিখিয়া পাঠান :—

> আমার মতে, কোন-কিছু করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষা-ব্যাপারে যাঁহারা অনুরাগী, সমাজের সেই সব মান্তগণ্য ব্যক্তির মতামত জানা উচিত ছিল। কিন্তু সভাতে তাঁহাদিগকে আহ্বানই করা হয় নাই, এবং তাঁহাদের সাহায্যও চাওয়া হয় নাই; এ অবস্থায় সরকারের নিকট প্রস্তাবিত আবেদনে আমার নাম সংযুক্ত রাখা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। প্রকৃতপক্ষে, যখন আমাকে সভায় উপস্থিত হইতে বলা হয়, তখন সোজাসুজি ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে, মিস্ কার্পেণ্টারের সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করাই সভার উদ্দেশ্য; তখন ঘূণাক্ষরেও ভাবি নাই যে, উহা যথারীতি সভা হইবে অথবা এরূপ গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা এত সংক্ষেপ হইতে পারে। সুতরাং এই ব্যাপারে আমি এমনই আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম যে, সভার আলোচনায় যোগদান অথবা আলোচ্য বিষয়ে মত প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। এ অবস্থায় দুঃখের সহিত আমি কমিটি হইতে আমার নাম প্রত্যাহার করিতেছি। (৩ ডিসেম্বর ১৮৬৬)

১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ তারিখে একখানি দীর্ঘ পত্রে বাংলার ছোট লাট সার্ উইলিয়ম গ্রে এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। এ-প্রস্তাবে পণ্ডিত সম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি উত্তরে ছোট লাটকে লিখিলেন,—

> আপনার সহিত শেষ সাক্ষাতের পর আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াছি এবং ব্যাপারটি বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বীটন-বিদ্যালয়েই হোক বা স্বতন্ত্রভাবেই হোক, হিন্দু-সমাজের গ্রহণোপযোগী এক দল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারী করিবার জন্ত মিস্ কার্পেণ্টার যে-উপায় অবলম্বন করিতে চান, তাহা কার্য্যে পরিণত

করা কঠিন,—এ বিষয়ে আমার মত পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বস্তুতঃ, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও দেশবাসীর মনোভাব এরূপ প্রতিষ্ঠানের পরিপন্থী; যতই ভাবিতেছি, আমার এ ধারণা ততই দৃঢ়তর হইতেছে। ইহা যে সাফল্য লাভ করিবে না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, সেই হেতু সরকারকে সাক্ষাৎভাবে এ কাজে নামিতে আমি কোন মতেই পরামর্শ দিতে পারি না। সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা যখন অবরোধ-প্রথা ভঙ্গ করিয়া দশ-এগার বছরের বিবাহিত বালিকাদেরই বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেয় না, তখন তাহারা বয়স্কা আত্মীয়াদের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিতে কিরূপে সম্মতি দিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল অসহায়া অনাথা বিধবাদেরই এ-কার্য্যে পাওয়া যাইতে পারে। নৈতিক দিক্ দিয়া শিক্ষাকার্য্যে তাহারা কত দূর উপযুক্ত হইবে, সে বিচার করিতেছি না, তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, অন্তঃপুর ছাড়িয়া সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাজে নামিয়াছে বলিয়াই তাহারা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাত্রী হইবে; ফলে এই অনুষ্ঠানের সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

সম্প্রতি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত ভারত-গবর্মেণ্টের পত্রখানিতে এক প্রশস্ততর পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জনসাধারণের মনোভাব বুঝিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়—সাহায্যদান-প্রণালীর প্রবর্ত্তন। দেশের লোক মিস্ কার্পেণ্টারের প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করিতে ইচ্ছুক হইলে সরকার তাহাদের সাহায্যার্থ যথেষ্ট বৃত্তির বন্দোবস্ত করিবেন। যত দূর বুঝিতেছি, হিন্দু-সমাজের অধিকাংশ লোকই এরূপ সাহায্যের সুবিধা গ্রহণ করিবে না; তবুও যাহারা ইহার সফলতায় অতিবিশ্বাসী, সত্যই যদি তাহাদের আন্তরিক আগ্রহ ও অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে, আশা করা যায়, তাহারাই অগ্রবর্ত্তী হইয়া সরকারী অর্থসাহায্যে এ-সম্বন্ধে ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

আমি স্পষ্ট স্বীকার করিতেছি, তাহাদের উপর আমার আস্থা নাই।

কিন্তু ভারত-সরকার যে বিধি প্রচার করিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহাদের অভিযোগ করিবার কিছুই থাকিবে না।

মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা যে কতটা অভিপ্রেত এবং প্রয়োজনীয়, তাহা আমি বিশেষ জানি,—এ কথা আপনাকে বলা বাহুল্য। আমার দেশবাসীর সামাজিক কুসংস্কার যদি অলঙ্ঘনীয় বাধারূপে না দাঁড়াইত, তাহা হইলে আমিই সকলের আগে এ প্রস্তাব অনুমোদন করিতাম এবং ইহাকে কার্য্যকর করিবার জন্য আন্তরিক সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। কিন্তু যখন দেখিতেছি, সাফল্যের কোনই নিশ্চয়তা নাই, এবং এ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সরকার অনর্থক অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়িবেন, তখন কোন মতেই আমি এ ব্যাপারে পোষকতা করিতে পারি না।

বীটন-বিদ্যালয়ের জন্য যে-পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, ফল তাহার অনুরূপ হয় নাই,—এ বিষয়ে আপনার সহিত আমি একমত। কিন্তু তাই বলিয়া বিদ্যালয়টি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করি না। যে মানব-হিতৈষী মহাত্মার নামের সহিত বিদ্যালয়টির নাম সংযুক্ত, তিনি ভারতে নারীজাতির শিক্ষাবিস্তারকল্পে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্মারক-রূপেও সরকারের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়ভার বহন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। মফস্বলের বালিকা-বিদ্যালয়গুলির পক্ষে আদর্শরূপে কাজ করিবে বলিয়াও এইরূপ শহরের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত এক সুব্যবস্থিত বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে। হিন্দু-সমাজের উপর এই বিদ্যালয়টির নৈতিক প্রভাব যথেষ্ট। চারি পাশের জেলা-সমূহে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে ইহা পথ প্রস্তুত করিয়াছে; তাই আমার বিবেচনায় ইহার পিছনে বছরে বছরে যে বিপুল অর্থব্যয় হয়, তাহা সার্থক বলিতে হইবে। কিন্তু এ কথাও সত্য, ব্যয়সঙ্কোচ ও উন্নতির

যথেষ্ট অবসর আছে। কার্য্যকারিতার হানি না করিয়াও বিদ্যালয়ের খরচ অর্দ্ধেক কমাইতে পারা যায়।

স্বাস্থ্যলাভের আশায় দীর্ঘকালের জন্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাইতেছি। বীটন-বিদ্যালয়ের পুনর্গঠন-সম্বন্ধে যদি আমার মতামত জানিতে চান, তাহা হইলে কলিকাতায় আপনার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে ও সাক্ষাতে আলোচনা করিতে পারি। (১ অক্টোবর ১৮৬৭)

কিন্তু বাংলা-সরকার মিস্ কার্পেণ্টারের কল্পিত ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন। শীঘ্র ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগও ঘটিল।

ছাত্রী-সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে এবং অন্যান্য নানা কারণে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বীটন-স্কুল-কমিটির মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, বিদ্যালয়ের এ অবস্থায় এক বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এই কারণে জুলাই মাসে কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন হইল। অধিবেশনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীকে লইয়া এক সাব-কমিটি গঠিত হয়। অনুসন্ধানের ফল সাব-কমিটি একটি রিপোর্টে দাখিল করিলেন (২৪ সেপ্টেম্বর)। রিপোর্ট-পাঠে বীটন-স্কুল-কমিটি সিদ্ধান্ত করিলেন, যত দিন মিস্ পিগট্ অধ্যক্ষ থাকিবেন, তত দিন বিদ্যালয়ের উন্নতির আশা নাই। কমিটি এ-বিষয়ে বাংলা-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইলেন।

বাংলা-সরকার মিস্ পিগট্কে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ হইতে সত্বর অপসারিত করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বীটন-স্কুল-কমিটিকে লিখিলেন:—

ছোট লাটের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কমিটি যেন অপর শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত না করেন। স্বর্গীয় বীটন তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্ত বাড়ীখানি

দান করিয়া গিয়াছেন। রাজস্ব হইতেও বছরে বছরে বেশ মোটা টাকা সাহায্যার্থ দেওয়া হয়। ছোট লাট মনে করেন, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে বর্ত্তমান অবস্থায় যেরূপ করা হইতেছে, এই-সকল দানের এতদপেক্ষা অধিকতর সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্কুলটি একটু ছোট করিয়া, তাহার সহিত শিক্ষয়িত্রীদের জন্ত একটি নর্ম্মাল স্কুল যোগ করিয়া দিলে, ছোট লাটের বিশ্বাস, সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে।

এইরূপ করাই যদি শেষে সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে শিক্ষা-বিভাগের আরও ঘনিষ্ঠ সংস্রবে লইয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে। এক জন ইংরেজের সভাপতিত্বে কমিটির দেশীয় সদস্তেরা এত দিন পর্য্যন্ত বীটন-বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এই ভদ্র মহোদয়েরা বিভাগীয় স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের সহযোগিতায় পরামর্শ-সভার সভ্যরূপে কাজ করিতে রাজী আছেন কি না, ছোট লাট জানিতে চান। (৩ মার্চ ১৮৬৮)

বীটন-স্কুল-কমিটি এই সর্ত্তে বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

ব্যয়সংক্ষেপ করা হইবে, কার্য্যকারিতাও বাড়িবে, এইরূপ প্রয়োজন-সাধনার্থ সরকার প্রস্তাবিত নর্ম্মাল স্কুল ও বীটন-স্কুল একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগ করিয়া দিলেন। মাসিক তিন শত টাকা বেতনে তিন বৎসরের জন্ত মিসেস ব্রিট্‌শে নামে এক মহিলা বীটন ও নর্ম্মাল স্কুলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। বীটন-স্কুল-কমিটি ভাঙিয়া গেল। ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন কমিটির সদস্তদের—বিশেষভাবে কমিটির সুদক্ষ সম্পাদক বিদ্যাসাগরকে—তাঁহাদের অতীত সাহায্যের জন্ত ধন্তবাদ দিলেন।

বিদ্যাসাগর এই নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করিতেন না সত্য, কিন্তু চাহিবামাত্র কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন

না। ২ মার্চ ১৮৬৯ তারিখে স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেব ডিরেক্টরকে লিখিতেছেন,—

> বীটন-স্কুল-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৩এ [ফেব্রুয়ারি] আমার হাতে দিয়াছেন। তিনি বহু ক্ষণ ধরিয়া আমার সহিত বিদ্যালয়-গৃহে এবং সংলগ্ন জমিতে বেড়াইলেন এবং ইহা হিন্দু-মহিলাদের থাকিবার পক্ষে উপযোগী করিতে হইলে কি কি দরকার, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।
>
> যত দিন কলিকাতায় থাকিবে, তত দিন নর্মাল স্কুলটি যে বিশেষ ফললাভ করিবে, এমন আশা তিনি করেন না। কিন্তু তবুও নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বিদ্যাসাগরের কথাই ফলিল। তিন বৎসর যাইতে-না-যাইতেই পরবর্ত্তী ছোট লাট সার্ জর্জ ক্যাম্পবেল বীটন-বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট নর্মাল স্কুলটি তুলিয়া দিবার আদেশ দিলেন। এইরূপ অনুষ্ঠানকে সফল করিতে গেলে দেশের রীতি ও সংস্কার অনুসারে যে তাহা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে, এ-বিষয়ে তাঁহার নিশ্চিত ধারণা হইয়াছিল। ডিরেক্টরের নিকট নিম্নলিখিত আদেশ-পত্র প্রেরিত হইল :—

> সাধারণভাবে সমস্ত বিষয়টি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়, তিন বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিবার পরও ফিমেল নর্মাল স্কুলটিকে সফল করিতে পারা যায় নাই। এ-সব বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ অভিজ্ঞ, সেই সব মহিলার সহিত ছোট লাট প্রায় একমত। তাঁহাদের মত এই, নারীদের ধর্ম্মসংস্রবহীন শিক্ষা ও সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দেওয়া বড়ই বিপদ্‌জনক। অতএব ৩১ জানুয়ারি ১৮৭২ তারিখের পর ফিমেল নর্মাল স্কুলটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হোক। (২৪ জানুয়ারি ১৮৭২)

উপরের লেখা হইতে বুঝা যাইবে, বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে বিদ্যাসাগরের কি উৎসাহ ও আগ্রহই না ছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে, এক হিন্দু মহিলা-সঙ্ঘ বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা করেন :—

> বীটন-বিদ্যালয়ের কমিটি জানাইতেছেন, কলিকাতায় মহিলা-অনুষ্ঠিত বিদ্যাসাগর-স্মৃতিরক্ষা-কমিটির সম্পাদকের নিকট হইতে ১৩৭০৲ টাকা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।' কোন হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইলে, পরবর্ত্তী দুই বৎসরের জন্য এই টাকার আয় হইতে তাহাকে একটি বৃত্তি দেওয়া হইবে।

সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণ

শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারিরূপে বিদ্যাসাগর অসাধারণ উৎসাহ এবং বিচক্ষণতার সহিত তাঁহার কাজ সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে সংস্কৃত-শিক্ষার সংস্কার, বাংলা-শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন এবং স্ত্রীশিক্ষার বহুল বিস্তার তাঁহার কাজ। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা বিষয়ে উপরিওয়ালারা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন। সুতরাং সকলেই আশা করিয়াছিল, প্র্যাট সাহেব ছুটি লইয়া বিলাতযাত্রা করায় দক্ষিণ-বাংলার ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুলের শূন্য পদে বিদ্যাসাগরই নিযুক্ত হইবেন। বস্তুতঃ ছোট লাট হ্যালিডের সহিত পণ্ডিতের এ-সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। নিম্নলিখিত পত্রাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে—

> গত শনিবার যখন আপনার সহিত দেখা করিয়া দক্ষিণ-বাংলার ইন্‌স্পেক্টর নিয়োগ সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলিবার অনুমতি প্রার্থনা

করি, আপনি তখন অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে একখানি লিখিত পত্র দাখিল করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি বিনীতভাবে প্রস্তাব করিতেছি,—যদি আপনি আমাকে ঐ পদে বাহাল করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে সংস্কৃত কলেজে আমার স্থলে যাঁহাকে আনা হইবে, তাঁহার নিয়োগ সম্বন্ধে আমার সহিত যেন পরামর্শ করা হয়; কেন-না, যে-সকল ব্যক্তির মধ্য হইতে নির্ব্বাচন হইবে, তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই, আমার মনে হয়, কে ঐ পদের উপযুক্ত, সে সম্বন্ধে আমিই ঠিক কথা বলিতে পারিব। আর সরকারী ইংরেজী কলেজ ও স্কুল থাকার দরুন বিভাগটি আমার হাতে দেওয়া যদি যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, অন্ততঃ যে-জেলায় মডেল স্কুল আছে—যেমন মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, নদীয়া, সেই জেলাগুলি যেন আমার হাতে দেওয়া হয়; কলেজ ও স্কুলগুলি বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টরের অধীন থাকিলে আর কোন অসুবিধা হইবে না। (মে, ১৮৫৭)

এই পত্র হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই হ্যালিডে এপ্রিল মাসে উড্রো সাহেবকে ঐ শূন্য পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর ইহাতে একান্ত নিরাশ হইলেন। তাঁহার প্রতি সুবিচার করা হয় নাই, তাঁহার পদোন্নতির ন্যায্য দাবি বার বার উপেক্ষিত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। শিক্ষা-বিভাগের নূতন ডিরেক্টর—গর্ডন ইয়ং নামক এক অনভিজ্ঞ যুবক সিভিলিয়ান তাঁহার কাজে উৎসাহের পরিবর্ত্তে নানা বাধা দিয়া আসিতেছেন, এজন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই বিরক্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য ছোট লাট হ্যালিডের মধ্যস্থতায় বিবাদের কতকগুলি কারণ দূরীকৃত হইয়াছিল। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কাজে তাঁহার যে পদোন্নতি হইয়াছে, এক জন কালা কর্ম্মচারীর পক্ষে তাহার অধিক আশা করা

বিড়ম্বনা—বিদ্যাসাগরের এই দৃঢ় ধারণা জন্মিল। তিনি সরকারী কর্ম্ম হইতে অবিলম্বে অবসর লইবেন স্থির করিলেন, এবং ডিরেক্টরকে জানাইলেন,—

> আপনি তিন মাসের জন্ত শহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন জানিয়া আমি মনে করিলাম, সরকারী কর্ম্ম হইতে শীঘ্র অবসর গ্রহণ করিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা আপনাকে জ্ঞাত করাইবার ইহাই প্রকৃত সুযোগ। এই সঙ্কল্পের মূলে যে-সকল কারণ আছে, তাহা ব্যক্তিগত—সাধারণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং সেগুলি বিবৃত করিতে বিরত হইলাম। (২৯ আগষ্ট ১৮৫৭)

হ্যালিডেও যাহাতে এই সংবাদ জানিতে পারেন, তজ্জন্য বিদ্যাসাগর তাঁহাকেও এই পত্রের এক প্রতিলিপি পাঠাইলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্কল্পের কথা পাঠ করিয়া হ্যালিডে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লিখিলেন,—

> প্রিয় পণ্ডিত, তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমি সত্য সত্যই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। বৃহস্পতিবার আমার সহিত দেখা করিতে আসিবে এবং জানাইবে, কেন তুমি এ সঙ্কল্প করিয়াছ। (৩১ আগষ্ট)

দক্ষ কর্ম্মচারীরা কাজ ছাড়িয়া দেয়, ইহা হ্যালিডের কাছে কখনই রুচিকর ছিল না। তিনি পণ্ডিতকে হঠাৎ কিছু না করিতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্যাসাগরও সম্মত হইলেন। যদিও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, তবুও তিনি আর এক বৎসর ঐ পদে কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাঙিতে সুরু হওয়ায় তিনি ৫ আগস্ট ১৮৫৮ তারিখে ডিরেক্টরের কাছে কর্ম্মত্যাগ-পত্র পাঠাইলেন,—

> সরকারী কর্ত্তব্যপালনে অবিরত মানসিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাহাতে আমার এমন গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে যে, বাংলার ছোট লাট বাহাদুরের নিকট আমার পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিতে বাধ্য হইলাম।

আমি মনে করি, আমার কর্ত্তব্যপালনে যে অবিশ্রান্ত মনোযোগের প্রয়োজন, তাহা আমি আর দিতে পারিব না। আমার বিশ্রামের দরকার। সাধারণের স্বার্থের খাতিরে এবং নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে সেই বিশ্রাম পাইতে পারি।

যে-মুহূর্ত্তে স্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইব, আমার ইচ্ছা, তন্মুহূর্ত্ত হইতে আমার সময় এবং চেষ্টা প্রয়োজনীয় বাংলা পুস্তক প্রণয়নে এবং সঙ্কলনে নিয়োগ করিব। স্বদেশবাসীর শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তার সম্পর্কে সরকারী কর্ম্মের সহিত আমার সাক্ষাৎ যোগ ছিন্ন হইয়া যাইতেছে সত্য, তবুও আমার অবশিষ্ট জীবন এই মহৎ এবং পবিত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ব্যয়িত হইবে। এ বিষয়ে আমার গভীর ও আন্তরিক অনুরাগ কেবল আমার জীবনের সহিত অবসান লাভ করিতে পারে।

এরূপ গুরুতর পন্থা অবলম্বন করিবার গৌণ হেতুগুলির মধ্যে দুইটি এই,—ভবিষ্যৎ উন্নতির আর কোন আশা নাই; এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের পক্ষে যে-সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়, বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত আমার সেই ব্যক্তিগত সহানুভূতির অভাব।

প্রথম কারণটির সম্পর্কে কথা এই,—বর্ত্তমান পদের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণ অল্প শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারিব। অস্বীকার করিতে পারি না, যে-ব্যক্তি এত দিন পর্য্যন্ত আপন পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ গ্রাসাচ্ছাদনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে এরূপ ভাবা অন্যায় নহে। এই পরিশ্রমসাধ্য গুরু কর্ত্তব্যের সংস্রব বিচ্ছিন্ন করিতে বিলম্ব করিলে ভগ্নস্বাস্থ্যবশে সেরূপ সংস্থান করাও আর চলিবে না।

দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য,—আমি মনে করি, সরকারের স্কন্ধে আমার মতামত চাপাইবার অধিকার নাই। তবুও, কর্ম্মের সহিত

আমার হৃদয়ের যোগ নাই—যাঁহাদের চাকুরী করি তাঁহাদের নিকট হইতে এ সত্য গোপন করিতে চাই না। এ কারণে আমার কর্ম্ম-কুশলতার অবশ্য হানি হইবে। বিবেকবুদ্ধিপরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারীর পক্ষে সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া কাজ করা এক প্রধান গুণ। এইরূপ সদুদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ইহা অপেক্ষা আরও বলিতে পারি না,—অধিক বলিতেও ইচ্ছুক নই।

আমার ক্ষুদ্রশক্তি অনুযায়ী যত দূর সম্ভব উৎসাহসহকারে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি, এই তৃপ্তি হৃদয়ে লইয়া আমি অবসর গ্রহণ করিতেছি। আশা করি, সরকার চিরদিন আমার প্রতি যে অবিচলিত অনুগ্রহ, বিবেচনা এবং স্নেহ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, তজ্জন্য আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ-পত্র অনুমোদন করিয়া, মঞ্জুরীর জন্য সরকারের কাছে পাঠাইলেন।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ব্যাপারে ডিরেক্টরের সহিত বিরোধের ফলেই বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন। কিন্তু হ্যালিডেকে লিখিত বিদ্যাসাগরের একখানি আধা-সরকারী পত্রে প্রকৃত কারণগুলি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাসাগর লিখিতেছেন,—

বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলাম, আমার পদত্যাগ-পত্রের যে-অংশগুলি আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকিয়াছে, সঙ্গতি বা ঔচিত্যের দিক্ দিয়া সে-অংশগুলি আমি উঠাইয়া লইতে পারি না। শারীরিক অসুস্থতা আমার পদত্যাগের একটি প্রধান কারণ বটে, কিন্তু বিবেকধর্ম্মানুসারে বলিতে গেলে ইহাকে একমাত্র কারণ বলিতে পারি না। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে দীর্ঘ অবসর গ্রহণ করিয়া আমি স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারিতাম। বর্ত্তমান অবস্থায় সরকারী চাকুরী করা যে আমার

পক্ষে অনেক সময় অপ্রীতিকর এবং অসুবিধাজনক বোধ হইয়াছে, এবং যে-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া বাংলার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চলিতেছে, যাহাতে যে অর্থের অপব্যয় হইতেছে মাত্র—এ সব কথা আপনাকে বহু বার বলিয়াছি। আপনি জানেন, আমি অনেক সময় কাজে বাধা পাইয়াছি। এ ছাড়া, দেখিয়াছি পদোন্নতির আর কোন আশা নাই; কারণ, আমার ন্যায্য দাবি একাধিক বার উপেক্ষিত হইয়াছে। অতএব আমি আশা করি, আপনি স্বীকার করিবেন, আমার অভিযোগের যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। (১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮)

ডিরেক্টরের অনুমোদন গ্রাহ্য করিয়া বাংলা-সরকার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—

পণ্ডিত মহাশয় যে কিঞ্চিৎ অসুস্থভাবে অবসর গ্রহণ করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন, ইহা দুঃখের বিষয়,—বিশেষতঃ তাঁহার যখন অসন্তোষের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। যাহা হউক, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে জানাইবেন যে, দেশবাসীর শিক্ষাবিস্তারকল্পে তিনি দীর্ঘকাল উৎসাহের সঙ্গে যে কাজ করিয়াছেন, তজ্জন্য সরকার তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮)

স্বাস্থ্যের অবনতি কর্মত্যাগের একটি কারণ বটে, কিন্তু পদোন্নতি সম্পর্কে আশাভঙ্গ এবং উপরিতন কর্মচারীর সহিত মতবিরোধই যে বিদ্যাসাগরকে সরকারী কর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহা উপরের চিঠিগুলি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ছোট লাট হ্যালিডে তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন; তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহিত সদয় ও ভদ্রব্যবহার করিতেন সত্য, কিন্তু যাঁহার অধীনতায় পণ্ডিতকে প্রতি দিন কাজ করিতে হইত, সেই সাক্ষাৎ উপরিতন কর্মচারী—শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের প্রতিবন্ধকতাচরণ এবং অনাত্মীয় ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের পক্ষে আর কাজ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

সুতরাং "পণ্ডিত কিঞ্চিৎ অসুস্থভাবে অবসর গ্রহণ করিলেন", বাংলা-সরকারের এই মন্তব্য অযথার্থ। বিদ্যাসাগরের চাকুরীর কাল দশ বৎসরের অধিক নহে; এত অল্প দিনের সরকারী কাজে আংশিক পেনশনেরও অধিকারী হওয়া যায় না সত্য, কিন্তু তাঁহার সম্পাদিত কর্ম্মের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে এককালীন কিছু টাকা দান করিলেই সরকারের পক্ষে শোভন হইত।

৩ নবেম্বর ১৮৫৮ তারিখে বিদ্যাসাগর নূতন অধ্যক্ষ ই. বি. কাওয়েলকে সংস্কৃত কলেজের কাজ বুঝাইয়া দিলেন।

ইহার কিছু দিন পরেই বিদ্যাসাগর বোর্ড অফ একজামিনার্সের সদস্য-পদ ত্যাগ করিলেন (মে, ১৮৬০)। ইহার কারণ তিনি ছোট লাটের সহিত সাক্ষাৎ-আলাপে বিবৃত করিয়াছিলেন।

সরকারের বে-সরকারী পরামর্শদাতা

সরকারী কর্ম্ম ত্যাগ করিলেও বে-সরকারী পরামর্শদাতা হিসাবে বিদ্যাসাগর সরকারের বহু উপকার সাধন করিয়াছিলেন। শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকার যখনই তাঁহার পরামর্শ চাহিয়াছেন, তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা দান করিয়াছেন। স্বল্প-পরিসর পুস্তকে সে-সকল বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ সম্ভব নয়। এখানে কেবল সংক্ষেপে দুই-চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইল মাত্র।

সংস্কৃত কলেজ

বিদ্যাসাগরের অবসরগ্রহণের অল্প দিন পরেই শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর সংস্কৃত কলেজের সংস্কার সংক্রান্ত এক প্রস্তাব এবং উড্রো, রোয়ার ও

সংস্কৃত কলেজের নূতন অধ্যক্ষ—কাওয়েল সাহেবের তদ্বিষয়ক মন্তব্যগুলি বাংলা-সরকারের কাছে পেশ করেন। এ বিষয়ে ছোট·লাট বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চাহিলে উত্তরে পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন,—

> …কাওয়েল সাহেব কলেজে স্মৃতি ও বেদান্তের পাঠ বন্ধ করিতে চাহেন। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মত মেলে না। আমার মনে হয়, এই বিষয়গুলিতে আপত্তি থাকিতে পারে না। স্মৃতি সম্বন্ধে যে-সকল পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত আছে, সেগুলির সাহায্যে শুধু উত্তরাধিকার, পোষ্যপুত্রগ্রহণ প্রভৃতি দেওয়ানী আইন শেখান হয়। এই সকল জিনিস অধিগত করিবার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন, অতএব এ-সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে প্রচলিত দর্শনসমূহের মধ্যে বেদান্ত অন্যতম। ইহা অধ্যাত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয়। কলেজে ইহার অধ্যাপনা বিষয়ে কোন যুক্তিসঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে, ইহা আমি মনে করি না। এই দুইটি বিষয় এখন যে-ভাবে শিখান হয়, তাহাতে ধর্ম্মগত কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। আমার বিনীত মত এই, এ-সকলের অধ্যাপনা বন্ধ করিলে কলেজের পাঠ্য-বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।…(১৭ এপ্রিল ১৮৫৯)

গণশিক্ষা

জনসাধারণের জন্য অল্প খরচার বিদ্যালয়ের কিরূপ ব্যবস্থা করা যায়, সেই বিষয়ে এবং সাধারণভাবে বাংলা-শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিসাধনের উপায় সম্বন্ধে ভারত-সরকার বাংলার ছোট লাট গ্র্যাণ্ট সাহেবের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। নিজের মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ছোট লাট শুধু শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারীদের নহে, গ্রাম্য বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে অথবা কৃষকের কল্যাণসাধনে যাঁহারা সচেষ্ট; এরূপ কয়েক জন ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোকের বক্তব্য জানিতে

চাহিলেন। ইহার মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন। বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে ছোট লাটকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

> বিলাতে এবং এদেশে এমনই একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার জন্ত যথেষ্ট করা হইয়াছে, এখন জনসাধারণের শিক্ষার দিকে মন ফিরাইতে হইবে। শিক্ষা-সংক্রান্ত রিপোর্ট ও মিনিটগুলি অত্যন্ত অনুকূল ভাবের হওয়ায় বুঝা যাইতেছে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে ভিন্ন অবস্থার কথা প্রকাশ পাইবে।
>
> একমাত্র কার্য্যকর উপায় না হইলেও বঙ্গে শিক্ষা-বিস্তারের শ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপ সরকার, আমার মতে, উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা-বিস্তার-কার্য্যে নিজেকে বদ্ধ রাখিবেন। এক শত বালককে লিখন-পঠন এবং কিছু অঙ্ক শিখান অপেক্ষা একটিমাত্র ছেলেকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে প্রজাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাপ্রচারে সরকার অধিকতর সহায়তা করিবেন। সমস্ত দেশটাকে শিক্ষিত করিয়া তোলা নিশ্চয় বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কোন রাজসরকার এরূপ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অথবা সাধন করিতে পারে কি না সন্দেহ। বলা যাইতে পারে, বিলাতে সভ্যতার অবস্থা অতি উন্নত হইলেও শিক্ষা-বিষয়ে তথাকার জনসাধারণের অবস্থা তাহাদের এদেশের ভ্রাতৃগণের অপেক্ষা কোন প্রকারে ভাল নয়।
>
> (২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯)

ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন

সাক্ষাৎভাবে এক জন বিশ্বস্ত সরকারী কর্ম্মচারীর পরিচালনায় ৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের নাবালক জমিদারদিগকে একটি স্বতন্ত্র বাটীতে একত্র রাখিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলিকাতায় ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন খোলা হয়। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মাসিক তিন শত টাকা বেতনে ইহার পরিচালক নিযুক্ত হন।

কিছু দিন পরে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য চারি জন পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; তাঁহারা প্রত্যেকেই বৎসরে তিন মাস করিয়া পরিদর্শন করিবেন স্থির হয়। এই পরিদর্শকদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর অন্যতম।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর হইতে বিদ্যাসাগর পরিদর্শন আরম্ভ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি সরকারের নিকট যে বিবরণী দাখিল করেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

> আমার মতে অপরাধের প্রকৃতি যাহাই হোক না, নাবালকদের শিক্ষায় দৈহিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা কর্ত্তব্য। এই শাস্তি অনিষ্টকর পরিণামের জন্য সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতেই বর্জ্জিত হইয়াছে। বেত্র-ব্যবহার না করিয়াও সেই সকল প্রতিষ্ঠানে শত শত ছাত্র পরিচালিত হইতেছে। ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনে ইহার প্রয়োজন কিছুমাত্র অনুভূত হয় না। আমার মতে এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত নাবালক জমিদারদের প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার মোটেই শোভন নয়। বালকদের শিক্ষাদান-কার্য্যে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দৈহিক শাস্তি পরিণামে অশুভজনক ; ইহাতে শাস্তিপ্রাপ্ত বালক না শোধরাইয়া বরং নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে আমি দৃঢ়ভাবে প্রস্তাব করিতেছি, এই নিয়ম যেন অবিলম্বে উঠাইয়া দেওয়া হয়। (১১ জানুয়ারি ১৮৬৫)

ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন সম্বন্ধে তাঁহার আর একটি রিপোর্ট হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনের উদ্দেশ্য—নাবালক জমিদারদের যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করা এবং তাহাদিগকে সমাজের সুযোগ্য সভ্য এবং সৎ জমিদাররূপে গড়িয়া তোলা। কিন্তু এখানে তাহারা যে শিক্ষা পায়, তাহা শিক্ষা-নামের অযোগ্য, এবং পল্লীসম্পর্কে প্রায় কিছুই না শিখিয়া কেবল অল্পস্বল্প ইংরেজীর জ্ঞান লইয়া সাধারণতঃ এই প্রতিষ্ঠান হইতে বিদায় গ্রহণ করে।...

এখানে শিক্ষিত কতকগুলি যুবকের পরবর্তী নিন্দনীয় জীবন প্রতিষ্ঠানটির অখ্যাতির কারণ হইয়াছে। আমি মনে করি, ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন হইতে নিক্রান্ত ছাত্রদের সহিত অন্ত তরুণ জমিদারের তুলনা করিলেই দেখা যাইবে শেষোক্ত তরুণরাই ভাল।...(১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫)

স্কুলপাঠ্য পুস্তক-নির্ব্বাচন কমিটি

১১ জুলাই ১৮৭৩ তারিখে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর অ্যাটকিনসন সাহেব ইংরেজী ও বাংলা স্কুলপাঠ্য পুস্তক-নির্ব্বাচন কমিটির সভ্য হইবার জন্য বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করিলে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

দুইটি কারণে আমি এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইতেছি। আমি গ্রন্থকার, অতএব কমিটির ব্যবস্থার সহিত আমার স্বার্থ সাক্ষাৎভাবে জড়িত। সেই হেতু আমার বিবেচনায় কমিটির আলোচনায় পক্ষগ্রহণ করা উচিত হইবে না। তা ছাড়া, আমি মনে করি, আমার উপস্থিতি আমার গ্রন্থগুলির দোষগুণের অপক্ষপাত স্বাধীন আলোচনায় অন্তরায় হইবে।

সহবাস-সম্মতি-আইন

সামাজিক বিষয়েও সরকার সময়ে সময়ে বিদ্যাসাগরের পরামর্শ লইতেন। সহবাস-সম্মতি-আইন বিল কাউন্সিলে উপস্থাপিত করিবার প্রাক্কালে, সরকারের অনুরোধে বিদ্যাসাগর যে অভিমত দিয়াছিলেন, তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

Though on these grounds I cannot support the Bill as it is, I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to childwives, without in any way conflicting with any religious usage. I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his

wife has had her first menses. As the majority of girls do not exhibit that symptom before they are thirteen, fourteen or fifteen, the measure I suggest would give larger, more real, and more extensive protection than the Bill. At the same time, such a measure could not be objected to on the ground of interfering with a religious observance.

* * *

From every point of view, therefore, the most reasonable course appears to me, to make a law declaring it penal for a man to have intercourse with his wife, before she has her first menses.... (16 Feby. 1891).

স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্রে

বিদ্যাসাগরের সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণ দেশ ও দশের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর হইয়াছিল। তাঁহার একটা মোটা রকমের আয় কমিয়া গেল বটে, কিন্তু তিনি মোটেই বিচলিত হইলেন না—তাঁহার স্বরচিত পুস্তক বিক্রয়ের আয়ই তখন মাসিক তিন-চার হাজার টাকা।* তিনি এইবার স্বাধীনভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইলেন।

মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন

মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠা তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। ইহাই বাঙ্গালীর নিজের চেষ্টায় নিজের অধীনে স্থাপিত উচ্চতর শিক্ষার প্রথম কলেজ। মেট্রোপলিটানের নাম এখন বিদ্যাসাগর কলেজ হইয়াছে।

* ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগে সংস্কৃত প্রেস স্থাপন করিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীও চালাইতে থাকেন। সংস্কৃত প্রেসে মুদ্রিত সকল পুস্তক বিক্রয়ের জন্য ডিপজিটারীতে মজুত থাকিত। ব্যবসায়টি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল এবং বহু বৎসর ধরিয়া ইহা হইতে রীতিমত লাভ হইত।

পূর্ব্বে ইহার নাম মেট্রোপলিটান ছিল না। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েক জন প্রতিষ্ঠাপন্ন ভদ্রলোক মিলিয়া শঙ্কর ঘোষের লেনে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে এক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সরকারী স্কুল অপেক্ষা অল্প বেতনে মধ্যবিত্ত ঘরের হিন্দু-বালকগণকে ইংরেজী শিক্ষা দান করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। মিশনরীদের স্কুলে মাহিনা কম ছিল বটে, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইত বলিয়া হিন্দুরা সেখানে ছেলেদের পাঠাইতে চাহিত না। প্রথম কয়েক মাস প্রতিষ্ঠাতারাই স্কুল পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহারা বিদ্যাসাগরকে ও তাঁহার বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্কুল-পরিচালনে সহায়তা করিতে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা স্বীকৃত হইলে এক পরিচালক-সমিতি গঠিত হইল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্য্যন্ত স্কুলটি এই সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। পরিচালকবর্গের মধ্যে কোন বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হওয়াতে এই বৎসরে দুই জন প্রতিষ্ঠাতা পদত্যাগ করিয়া এক প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।

শিক্ষাপ্রচার এবং বিদ্যালয়-পরিচালনে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব অসাধারণ। তা ছাড়া তিনি নিঃস্বার্থভাবে সাধারণের কার্য্য করিতেন। ইহা বুঝিয়াই অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতারা বিদ্যাসাগর এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর ও হীরালাল শীলের হাতে বিদ্যালয় পরিচালনের ভার দিয়া অবসরগ্রহণ করিলেন। নূতন কমিটি গঠিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেক্রেটরী নিযুক্ত হইলেন। স্কুলের নানারূপ সংস্কারে হাত দিয়া বিদ্যালয়ের সুপরিচালনার জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিলেন। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য—হিন্দু-বালকগণকে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সম্যক্‌রূপে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া হইতে

বিদ্যালয়টির নূতন নাম হয়—হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন। ইতিমধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচালনার গুণে ছাত্রগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিল। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ (ইং ১৮৬৬) এবং হরচন্দ্র ঘোষের (ইং ১৮৬৮) মৃত্যুতে এবং তৎপূর্ব্বে অপর তিন জন সদস্যের পদত্যাগে বিদ্যালয় পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার বিদ্যাসাগরের উপর পড়িল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দ্বারকানাথ মিত্র ও কৃষ্ণদাস পালকে লইয়া তিনি এক কমিটি গঠন করিলেন এবং বিদ্যালয়ে যাহাতে বি. এ. পর্য্যন্ত পড়া যায়, তদ্বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করিলেন। বি. এ. পড়াইবার অধিকার না পাইলেও ইহাতে ফার্স্ট আর্টস্ পর্য্যন্ত পড়িতে পারা যাইবে, ইহা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর করিলেন।* ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষায় মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। দেশীয় লোকের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের এই সাফল্য দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সাট্‌ক্লিফ সাহেব বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত তাক্ লাগাইয়া দিয়াছেন!" ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান ফার্স্ট গ্রেড

---

* "এত দিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনটি কলেজে পরিণত হইল। আপাতত উহাতে এল, এ, কোর্স পর্য্যন্ত পড়ান হইবে। গবর্ণমেণ্ট উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করিয়া লইতে স্বীকার করিয়াছেন। পাঁচ বৎসর হইল, এইরূপ একখানি আবেদন করা হয় কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তখন তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। দেশীয়দিগের দ্বারা স্বাধীনভাবে প্রথম এই কলেজ স্থাপিত হইল।...আগামী জানুয়ারীর প্রথমেই কলেজটি খোলা হইবে। এল, এ ক্লাসে আপাতত পাঁচ টাকা বেতন লওয়া হইবে। কলিকাতার মধ্যে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনটি একটি প্রধান স্কুল সুতরাং কলেজ হইলে যে উহা উত্তমরূপ চলিবে তাহা বিলক্ষণ রূপে আশা করা যাইতে পারে।" —'অমৃত বাজার পত্রিকা,' ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২।

কলেজে পরিণত হইল, এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এখান হইতে ছাত্রেরা বি. এ. পরীক্ষা দিতে প্রেরিত হইল। পরীক্ষার ফল ভালই হইল।

ইউরোপীয় শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত কোন কলেজ যে ভাল চলিতে পারে অথবা অধ্যাপনা ভাল হইতে পারে, ইহা লোকের ধারণার অতীত ছিল। বিদ্যাসাগর নিজের কলেজে ভারতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া দেখাইলেন, কলেজের অধ্যাপনায় বিলাতী অধ্যাপকেরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নয়, ভারতীয় শিক্ষকের দ্বারা অনুরূপ, এমন কি কোন কোন বিষয়ে উৎকৃষ্টতর শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। মেট্রোপলিটানের সাফল্য দেখিয়া অন্যান্য কলেজ হইতে অনেক ছাত্র এই কলেজে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা-বিস্তারের এক নূতন দিক্ খুলিয়া দিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, বে-সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠার তিনিই প্রবর্ত্তক। তিনি যখন যে-কাজে হাত দিতেন, সে-কাজ সার্থক না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তা ছাড়া, শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল বিপুল। সারা বাংলার শিক্ষা-বিস্তারে যে-প্রতিভা নিযুক্ত ছিল, তাহা একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে, সেই প্রতিষ্ঠান অতুলনীয় সফলতা লাভ করিল।

বিদ্যাসাগরের আর একটি বড় গুণ ছিল। তিনি পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন না, সকল কাজ নিজে দেখিতেন। তিনি অনেক সময় বিদ্যালয়ে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া দেখিতেন নিয়ম-মত কাজ চলিতেছে কি-না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশ ছিল, শিক্ষকেরা কখনও বালকদের উপর শারীরিক শাস্তি বিধান করিতে পারিবেন না। তিনি বলিতেন, শান্ত সদয় ব্যবহারের দ্বারা ছাত্রদের দোষ সংশোধন করিতে চেষ্টা করা উচিত। যাহাকে সংশোধনের অতীত বলিয়া বোধ হইত, তেমন ছাত্রকে তিনি বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করিতেন।

ভারত-সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বাক্‌লাণ্ড সাহেব তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

> ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে এক সুপরিচিত ঘটনা। এই ধরণের পরবর্ত্তী বহু বিদ্যালয়ের ইহা আদর্শস্থানীয়। মেট্রোপলিটান কলেজের সংশ্লিষ্ট স্কুলে আট শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত; এতদ্ব্যতীত কলিকাতাতেই এই বিদ্যালয়ের চার-পাঁচটি শাখা বিদ্যমান ছিল।

যে জমির উপর এখন কলেজটি অবস্থিত, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহা কেনা হয়। সুবৃহৎ বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া হইতেই এখানে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়।

হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফণ্ড

প্রধানতঃ বিদ্যাসাগরের প্রাণপণ চেষ্টায়, ১৫ জুন ১৮৭২ তারিখে কলিকাতায় একটি হিতকর প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়; ইহা হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফণ্ড। আয় অল্প বলিয়াই সাধারণ বাঙালী গৃহস্থ মৃত্যুকালে স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গের কোনরূপ সংস্থান করিয়া যাইতে পারে না। যাহাতে এরূপ অবস্থার উদ্ভব না হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। ইহার ট্রষ্টি নিযুক্ত হইয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র। বোর্ড অফ ডিরেক্টরের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও নরেন্দ্রনাথ সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত বিদ্যাসাগর তিন বৎসর—১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহার কর্ম্মপরিচালনায় কতকগুলি বিশৃঙ্খলা ঘটায় বিদ্যাসাগর আর নিজেকে ইহার সহিত যুক্ত

রাখিতে চাহেন নাই। ২৩ ডিসেম্বর ১৮৭৫ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ :—

> কলিকাতা হিন্দু ফ্যামিলী এনিউটী ফণ্ড নামক যে একটি আফিস খোলা হইয়াছিল উহা পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও হাইকোর্টের জজ বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র এবং অন্যান্য কয়েক জন প্রধান লোক ইহার সঙ্গে সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ তারিখে তিনি ডিরেক্টরদের ইংরেজীতে যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অংশ-বিশেষের বঙ্গানুবাদ দিতেছি :—

> এই ফণ্ডের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে আমি আমার সমস্ত মনোযোগ ও চেষ্টা নিয়োগ করিয়াছিলাম। এই বৃক্ষের ফল উপভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া আপনারা আশান্বিত, কিন্তু আমি এইরূপ কোন আশা পোষণ করি না। আমার ধারণা, প্রত্যেকেই স্বদেশের মঙ্গল, সাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি এ বিষয়ে আমার সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা নিয়োগ করি। নিজের স্বার্থসাধন আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এই ফণ্ড সম্পর্কে আমার প্রীতি আপনাদের সকলের অপেক্ষা অধিক, এই কথা যখন বলি—এবং এ কথা আমাকে বলিতেই হইবে—তখন সে-কথা আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি-না জানি না। সম্পূর্ণরূপে সেই প্রীতি বিস্মৃত হওয়ার কত দুঃখ, তাহা আমার অন্তরের অন্তস্তলই জানে। যাঁহাদের আপনারা পরিচালন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা সরল পথে চলেন না। এই ফণ্ডের সহিত আর সংযুক্ত থাকিলে ভবিষ্যতে আমাকে দুর্নামের ভাগী হইতে হইবে এবং ঈশ্বরের কাছেও জবাবদিহি করিতে হইবে। এই ভয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই ফণ্ডের সহিত আমার সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিতেছি।

দয়া দাক্ষিণ্য

দরিদ্র এবং আর্ত্তের সহায়, দয়ালু দাতা এবং জনহিতৈষিরূপে বিদ্যাসাগরের তুলনা নাই। এই মহদ্‌গুণের জন্য আজ তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। কাহাকেও বিপন্ন দেখিলেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত এবং লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। আজও তিনি দেশবাসীর নিকট "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর" নামে পরিচিত। দুঃস্থ এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করিতে তাঁহার আয়ের অধিকাংশই ব্যয়িত হইত। তাঁহার সাহায্যেই বহু দরিদ্র বিধবার সংসার চলিত। শত শত অনাথ বালকের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার তিনি নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহে গৃহে তাঁহার নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হইত। ধনিদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। শুধু বন্ধু এবং সহকর্ম্মীরাই নয়, তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার সাহস ছিল অতুলনীয় এবং দাক্ষিণ্য অপূর্ব্ব। অথচ তিনি নিজে নিতান্ত সরল জীবন যাপন করিতেন। এই তেজস্বী দানবীর সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে বড় বড় জমিদারের মাথা আপনি নত হইয়া পড়িত।

রাজ-সম্মান

অবসরগ্রহণের বিশ বৎসর পরে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নববর্ষের প্রথম দিনে ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধিদানে বিদ্যাসাগর নন, সরকার নিজেই সম্মানিত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে (৪ জুলাই ১৮৬৪) বিদ্যাসাগর বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনরারি মেম্বর—সম্মানিত সভ্য—নির্ব্বাচিত হন।* এই

* *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1865, p. 15.

উচ্চসম্মান লাভ এ-যাবৎ কালের মধ্যে মুষ্টিমেয় বাঙালীর ভাগ্যেই ঘটিয়াছে।

ছোট লাট সার্ রিচার্ড টেম্পলের আমলে তাঁহাকে এই সম্মান-লিপি প্রদান করা হয়,—

> বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের নেতারূপে তাঁহার আন্তরিকতা এবং ভারতবর্ষীয় সমাজের অগ্রগামী দলের নায়করূপে তাঁহার মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ইহা প্রদত্ত হইল। (১ জানুয়ারি ১৮৭৭)

মৃত্যু

তাঁহার শরীর পূর্ব্বেই ভাঙিয়া গিয়াছিল। ক্রমেই তিনি বিশেষরূপে অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনের বিয়োগ-ব্যথা এবং কয়েক বৎসরব্যাপী রোগভোগে দেহ সম্পূর্ণরূপে বিকল হইয়া গেল। তিনি কঙ্কালসার হইয়া পড়িলেন। একে একে শ্রমসাধ্য সকল কার্য্যই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। নগরের কলকোলাহল তাঁহার আর সহ্য হইত না। তিনি নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে লাগিলেন। কার্ম্মাটারের বাড়ীতেই তিনি বেশী যাইতেন।

শরীর আর রহিল না। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ জুলাই পূর্ণ ৭০ বৎসর বয়সে বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

২৭ আগস্ট ১৮৯১ তারিখে ছোট লাট সার্ চার্লস এলিয়টের সভাপতিত্বে কলিকাতার টাউন-হলে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায়, ইহাই ছিল সভার আলোচ্য বিষয়। সভার ফলে

সেই বিরাট্ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের এক প্রস্তরমূর্ত্তি কলেজ-ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিদ্যাসাগর ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা গদ্য-সাহিত্যে প্রথম শিল্পবোধসম্পন্ন স্রষ্টা ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তিনি যখন গদ্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন ভাষার ব্যাকরণ-অভিধানও সুষ্ঠুভাবে রচিত এবং সঙ্কলিত হয় নাই, অথচ নানা অপ্রচলিত ও পঙ্গু শব্দকে পাশাপাশি যোজনা করিয়া মৃত্যুঞ্জয় সাহিত্যের এক বিচিত্র রস উদ্বুদ্ধ করিতে অংশতঃ সক্ষম হইয়াছিলেন। বাংলা-গদ্যের শিল্পী হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সাক্ষাৎ বংশধর। মাঝখানে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা উপকরণ-সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছিলেন; বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব, সাময়িক-সংবাদ প্রচার প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বাংলা ভাষার নানা সম্ভাবনা তাঁহাদের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং এই সকল পরীক্ষার ফলে ভাষা এমন একটা নমনীয়তা লাভ করিয়াছিল, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ের আমলে ছিল না। বিদ্যাসাগর এই নমনীয় উপাদান লইয়া সত্যকার শিল্প সৃষ্টি করিলেন, তিনিই বাংলা গদ্য-সাহিত্যে প্রথম কৃতী শিল্পী।

তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; ইহার পূর্ব্বে 'বাসুদেবচরিত' নামক যে-পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রিত হয় নাই। ঐ রচনার যেটুকু আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, বিদ্যাসাগর তখন সবেমাত্র পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, ভাষার শিল্পরূপ তখনও তিনি ধরিতে পারেন নাই। সিভিলিয়ান সাহেবদের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে বসিয়া

তিনি বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা নিশ্চয়ই মনে মনে পুলক-বিস্ময়ের সহিত অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে 'উপক্রমণিকা', 'ঋজুপাঠে'র পথেই তাঁহার গতি দীর্ঘপ্রসারী হইত, 'শকুন্তলা' 'সীতার বনবাস'কে ভিত্তি করিয়া বাংলা-সাহিত্য আজ এমন বিরাট্ সৌধের গর্ব্ব করিতে পারিত না।

উদারহৃদয় ঈশ্বরচন্দ্র নিজের প্রতিভাগুণে শিল্পিজনসুলভ সৃষ্টির আনন্দে মত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। বাংলা দেশের অসহায় শিশু ও বালক-বালিকাদের কথা স্মরণ করিয়া আপন শিল্পপ্রতিভাকে দমন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্য 'বর্ণপরিচয়,' 'বোধোদয়', 'কথামালা', 'আখ্যানমঞ্জরী'রূপ চিরস্থায়ী খেলনা সৃষ্টি করিয়া নিজের বৃহত্তর শিল্পসৃষ্টিকে খণ্ডিত করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক প্রতিভা বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া আমরা সাক্ষ্য-স্বরূপ খুব উচ্চ ধরণের কোনও সৃষ্টিকে বিচারকের সম্মুখে দাখিল করিতে পারি না বটে, কিন্তু এ কথা নিঃসংশয়ে স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, গোটা বাংলা ভাষাটাই তাঁহার প্রতিভার সাক্ষ্যস্বরূপ দীর্ঘকালের জন্য রহিয়া গেল।

আর একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। যাঁহারা মনে করেন, বিদ্যাসাগরের লেখনী অনুবাদের পথেই স্ফূর্ত্ত হইয়াছে, তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা নাই, তাঁহারা তাঁহার রচিত মৌলিক রচনাগুলির সহিত পরিচিত নহেন। তাঁহার 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব', 'বিধবাবিবাহ', 'বহুবিবাহ', 'আত্মচরিত' এবং বেনামী রচনাগুলি পাঠ করিলে তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা সকলেই উপলব্ধি করিবেন। তাঁহার ভাষা স্থির হইয়া থাকে নাই, উত্তরোত্তর প্রাঞ্জল এবং শিল্পগুণসম্পন্ন হইয়াছে। ভাষা-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও গতানুগতিক ও

প্রাচীনপন্থী ছিলেন না ; বরং এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রগতিশীল বলা যাইতে পারে। সময় ও শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুবিধা পাইলেই ভাষার পরিবর্ত্তন ও মার্জ্জনা সাধন করিতেন। বাংলা-গদ্যের ছন্দ-সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী'র "সাহিত্য" খণ্ডের ভূমিকায় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের যশোবিস্তারের পূর্ব্বে সাহিত্যিক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

> প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটী স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটীর নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধু-জনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটীর নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এস্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে।…
>
> এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।*

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বাংলা-সাহিত্যের সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিদ্যাসাগর-চরিতে' অননুকরণীয় ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

---

* "বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী, ১২৯৯)

তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনও সাহিত্য-সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানব-সভ্যতার ধাতৃগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়…তবেই তাঁহার এই কীর্ত্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।…

বিদ্যাসাগর বাঙ্গলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলায় গদ্য-সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা-গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।…বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা গদ্যভাষার উচ্ছৃখল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছেন —এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্ত্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।…

বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা লেখায় সর্ব্বপ্রথমে কমা, সেমিকোলন্ প্রভৃতি ছেদচিহ্নগুলি প্রচলিত করেন।…বাস্তবিক একাকার সমভূম বাঙ্গলা রচনার মধ্যে এই ছেদ আনয়ন একটা নবযুগের প্রবর্ত্তন। এতদ্দারা, যাহা জড় ছিল তাহা গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে।…

বাঙ্গলা ভাষাকে পূর্ব্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাঙ্গলা-গদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা-গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং

গ্রাম্য বর্ব্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য্য ভাষা রূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলা-গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃজনক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।—"বিদ্যাসাগর-চরিত", 'সাধনা', ভাদ্র, ১৩০২।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার বিভিন্ন রচনা হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হইল :—

একে কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা; তাহাতে আবার, ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া, মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল; আর, ভূতপ্রেতগণ চতুর্দিকে ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল। এইরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয়সঞ্চার হয়। কিন্তু রাজার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশ মাত্র উপস্থিত হইল না। পরিশেষে, নানা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, রাজা নির্দ্দিষ্ট প্রেতভূমিতে উপনীত হইলেন; দেখিলেন, কোনও স্থলে অতি বিকটমূর্ত্তি ভূতপ্রেতগণ, জীবিত মনুষ্য ধরিয়া, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতেছে; কোনও স্থলে ডাকিনীগণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ধরিয়া, তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চর্ব্বণ করিতেছে। রাজা, ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে শিরীষবৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখিলেন, উহার মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত, প্রত্যেক বিটপ ও পল্লব ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে; আর, চারি দিকে অনবরত কেবল মার্ মার্, কাট্ কাট্, ইত্যাদি ভয়ানক শব্দ হইতেছে।—'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', গ্রন্থাবলী, "সাহিত্য", পৃ. ১৭।

ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস,

হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে; ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে, সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে, আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই, সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে, যাহারা, সতত জাতিভ্রংশকর, ধর্ম্মলোপকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া, কালাতিপাত করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্ম্মলোপ হয় না; কিন্তু যদি কেহ, সতত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ যত্নবান্ না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাষণ মাত্র করিলেও, এক-কালে সকল ধর্ম্ম লোপ হইয়া যায়।...

হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কত কালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, ভাবিয়া স্থির করা যায় না।...

...তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা

বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্ম গ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্ম গ্রহণ কর, বলিতে পারি না!—'বিধবাবিবাহ, ২য় পুস্তক', গ্রন্থাবলী, "সমাজ", পৃ. ১৮৫-৮৭।

সীতা অন্য দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, এ দিকে আমাদের দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া, আতপনিবারণ করিয়াছিলেন। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম। আমরা কুটীরে

থাকিতাম ; লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া আহারোপযোগী ফল মূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন ; গোদাবরীতীরে মৃদু মন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া, আমরা প্রাহ্নে ও অপরাহ্নে শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের সেবন করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।—'সীতার বনবাস', গ্রন্থাবলী, "সাহিত্য", পৃ. ৩১৪-১৫।

বৎসে প্রভাবতি! তুমি, দয়া, মমতা ও বিবেচনায় বিসর্জ্জন দিয়া, এ জন্মের মত, সহসা, সকলের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছ। কিন্তু আমি, অনন্যচিত্ত হইয়া, অবিচলিত স্নেহভরে তোমার চিন্তায় নিরন্তর এরূপ নিবিষ্ট থাকি যে, তুমি, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতে পার নাই।…

…আমি, সর্ব্ব ক্ষণ, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি ও নিরতিশয় প্রীতিপদ অনুষ্ঠান সকল অবিকল প্রত্যক্ষ করিতেছি ; কেবল, তোমায় কোলে লইয়া, তোমার লাবণ্যপূর্ণ কোমল কলেবর পরিস্পর্শে, শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না।…

বৎসে! তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যখন, তুমি এত সত্বর চলিয়া যাইবে বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই সর্ব্বাংশে উচিত ছিল। তুমি, স্বল্প সময়ের জন্য আসিয়া, সকলকে কেবল মর্ম্মান্তিক বেদনা দিয়া গিয়াছ। আমি যে, তোমার অদর্শনে, কত যাতনাভোগ করিতেছি, তাহা তুমি একবারও ভাবিতেছ না।…

…একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম। যখন, চিত্ত বিষম অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে, তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, আমায়

সর্ব্ব শরীর, তৎক্ষণাৎ, যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত। বৎসে! তোমার কি অদ্ভুত মোহনী শক্তি ছিল, বলিতে পারি না। তুমি অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের, এবং চিরশুষ্ক মরুভূমিতে প্রভূত প্রস্রবণের, কার্য্য করিতেছিলে।...

...তুমি, স্বল্প কালে নরলোক হইতে অপসৃত হইয়া, আমার বোধে, অতি সুবোধের কার্য্য করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক সুখভোগ করিতে; হয় ত, অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ, অশেষবিধ যাতনাভোগের একশেষ ঘটিত। সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে, তুমি, দীর্ঘজীবিনী হইলে, কখনই, সুখে ও সচ্ছন্দে, জীবনযাত্রার সমাধান করিতে পারিতে না।

কিন্তু, এক বিষয়ে, আমার হৃদয়ে নিরতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়া রহিয়াছে। অন্তিম পীড়াকালে, তুমি, উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া, জলপানের নিমিত্ত, নিতান্ত লালায়িত হইয়াছিলে। কিন্তু, অধিক জল দেওয়া চিকিৎসকের মতানুযায়ী নয় বলিয়া, তোমায় ইচ্ছানুরূপ জল দিতে পারি নাই।...

...তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি, চিরদিনের নিমিত্ত, আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবেক। কালক্রমে পাছে তোমায় বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায়, তোমার যার পর নাই চিত্তহারিণী ও চমৎকারিণী লীলা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।...

বৎসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্ম্মের এইটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে, আমাদের মত, অবিরত, দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।—"প্রভাবতীসম্ভাষণ", গ্রন্থাবলী, "সাহিত্য", পৃ. ৩৭১-৭৬।

যদি আপনারা বলেন, তুমি কে হে বাপু; তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা কেন। তুমি, বামন হয়ে, আকাশের চাঁদ ধরিতে চাও? তোমার এমন কি ক্ষমতা, যে তুমি বিশ্ববিজয়ী দিগ্‌গজ পণ্ডিতের গুণ বর্ণন করিবে। আমার উত্তর এই, সবিশেষ না জানিয়া শুনিয়া, সহসা আমায় হেয়জ্ঞান করিবেন না। আমি এক জন; যথার্থ কথা বলিতে গেলে, আমি নিতান্ত যেমন তেমন এক জন নই। আমার পরিচয় শুনিলে, আপনারা চমকিয়া উঠিবেন, সে বিষয়ে এক কড়ারও সংশয় নাই। 'বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরিতে চাও', এ কথাটি, বোধ হয়, আপনারা ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন। আমি কিন্তু, ঠাট্টা না ভাবিয়া, শ্লাঘা জ্ঞান করিতেছি। আমাদের বংশমর্য্যাদা অতি বেয়াড়া। বামন বংশের আদিপুরুষ ভারতবর্ষের পঞ্চম অবতার। তিনি, ত্রিলোকবিজয়ী বলি রাজার যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, কি ফেসাৎ, কি কারখানা, করিয়াছিলেন, তাহা কি কখনও আপনাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই।

বাপ কা বেটা সিপাহী কা ঘোড়া
কুছ না রহে তব ভি থোড়া।

যদিও, যুগমাহাত্ম্যে, আদিপুরুষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাদের না থাকে, কিছু ত থাকিবে। তিনি এক পদে সমস্ত আকাশমণ্ডল আক্রমণ করিয়াছিলেন; আমরা কি, তাঁহার বংশের তিলক হইয়া, আকাশমণ্ডলের এক অংশেও হাত বাড়াইতে পারিব না। অবশ্য পারিব। আর, ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, আমি যাঁহাকে ধরিতে চাহিতেছি, তিনি আকাশের চাঁদ নহেন, নদিয়ার চাঁদ। নদিয়ার চাঁদকে ধরিতে যাওয়া, আমার মত বেহুদা বাহাদুরের পক্ষে, নিতান্ত অসংসাহসিকের কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না।—'ব্রজবিলাস', গ্রন্থাবলী, "সমাজ", পৃ. ৫৩৫-৩৬।

গ্রন্থপঞ্জী

বিদ্যাসাগরের সর্ব্বপ্রথম রচনা—'বাসুদেবচরিত' শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার কোন কোন জীবনচরিতে ইহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগরের রচিত, সঙ্কলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা বড় অল্প নহে। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে দুই-চারিখানির কথা বাদ দিলে বাকী সমস্তই অনুবাদ, অনুসৃতি বা পাঠ্য পুস্তক। অবশ্য, এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, তখনকার দিনে এরূপ উত্তম পাঠ্য পুস্তকের বিলক্ষণ অভাব ছিল।

নিম্নে যে গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হইল, তাহাতে কেবলমাত্র পুস্তকের ১ম সংস্করণের প্রকাশকালই দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার প্রত্যেক পুস্তকের অনেকগুলি করিয়া সংস্করণ হইয়াছিল। ভাষা সম্বন্ধে প্রগতিশীল ছিলেন বলিয়া প্রত্যেক সংস্করণেই তিনি কিছু-না-কিছু সংস্কার করিয়াছেন।

(ক) রচিত ও সঙ্কলিত

১। **বেতাল পঞ্চবিংশতি**। ইং ১৮৪৭। পৃ. ১৬৩।

> বেতালপঞ্চবিংশতি। কালেজ্ আফ্ কোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত মেজর জি. টি. মার্শাল মহোদয়ের আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অনুসারে লিখিত কলিকাতা শ্রীযুত পি. এস. ডি. রোজারিও কোম্পানির মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশিত সংবৎ ১৯০৩

২। **বাঙ্গালার ইতিহাস,** ২য় ভাগ। ইং ১৮৪৮।

৩। **জীবনচরিত।** সেপ্টেম্বর ১৮৪৯।

৪। **বোধোদয়।** (শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ)। এপ্রিল ১৮৫১।

৫। **সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা।** নবেম্বর ১৮৫১।

৬। **ঋজুপাঠ,** ১ম ভাগ। নবেম্বর ১৮৫১।

ইহার ৩য় ভাগ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর ও ২য় ভাগ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়।

৭। **সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব।** মার্চ ১৮৫৩।

৮। **ব্যাকরণ কৌমুদী,** ১ম ভাগ। ইং ১৮৫৩।

ইহার ২য় ভাগ ১৮৫৩, ৩য় ভাগ ১৮৫৪ এবং ৪র্থ ভাগ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৯। **শকুন্তলা।** ডিসেম্বর ১৮৫৪।

১০। **বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব।** জানুয়ারি ১৮৫৫।

১১। **বর্ণপরিচয়,** ১ম ভাগ। এপ্রিল ১৮৫৫।

ইহার ২য় ভাগ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত হয়।

১২। **বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক।*** অক্টোবর ১৮৫৫।

* ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর তাঁহার 'বিধবাবিবাহ' পুস্তক দুইখানির ইংরেজী অনুবাদ *Marriage of Hindu Widows* নামে প্রকাশ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইহা বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রী কর্ত্তৃক মরাঠীতেও অনুদিত হয়।

১৩। **কথামালা**। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬।

১৪। **চরিতাবলী**। জুলাই ১৮৫৬।

১৫। **মহাভারত (উপক্রমণিকাভাগ)**। জানুয়ারি ১৮৬০।

১৬। **সীতার বনবাস**। এপ্রিল ১৮৬০।*

১৭। **আখ্যানমঞ্জরী**। নবেম্বর ১৮৬৩।

ইহার মাত্র ছয়টি আখ্যান লইয়া এবং কতকগুলি নূতন আখ্যান দিয়া 'আখ্যানমঞ্জরী, প্রথম ভাগ', এবং প্রথম বারের বাকী আখ্যানগুলির সহিত সাতটি নূতন আখ্যান যোগ করিয়া 'আখ্যানমঞ্জরী, দ্বিতীয় ভাগ' ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রচারিত হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে 'আখ্যানমঞ্জরী ২য় ভাগ' নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "এই পুস্তকের যে ভাগ, ইতঃপূর্ব্বে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইবেক।"

১৮। **শব্দমঞ্জরী** (বাঙ্গলা অভিধান)। ইং ১৮৬৪।

১৯। **ভ্রান্তিবিলাস**। অক্টোবর ১৮৬৯।

২০। **বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার**। জুলাই ১৮৭১।

* ২য়-৪র্থ সংস্করণের পুস্তকে "প্রথম বারের বিজ্ঞাপন"-এর শেষে ১৯১৭ সংবৎ ১ বৈশাখ—এই তারিখ পাওয়া যায়, কিন্তু শেষের কতকগুলি সংস্করণে "১৯১৮ সংবৎ, ১ বৈশাখ" মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম তারিখটিই ঠিক। ২১ মে ১৮৬০ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

> "নূতন গ্রন্থ।—শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস নামে একখানি নূতন গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। আমরা উহার একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি।..."

২১। **বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক।** মার্চ ১৮৭৩।

২২। **নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস।** এপ্রিল ১৮৮৮।

২৩। **পদ্যসংগ্রহ।** ইং ১৮৮৮।
ইহার ২য় ভাগ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

২৪। **সংস্কৃত রচনা।** নবেম্বর ১৮৮৯।

২৫। **শ্লোকমঞ্জরী।** মে ১৮৯০।

২৬। **বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)।** সেপ্টেম্বর ১৮৯১।

২৭। **ভূগোলখগোলবর্ণনম্।** এপ্রিল ১৮৯২।

বিদ্যাসাগর-কর্তৃক সঙ্কলিত তিনখানি ইংরেজী পুস্তকের কথা জানা যায়:—

Selections from the Writings of Goldsmith
Selections from English Literature
Poetical Selections

(খ) বেনামী রচনা

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া বিদ্যাসাগর পাঁচখানি পুস্তক প্রচার করেন। ইহার প্রথম তিনখানি "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য", চতুর্থখানি "কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ" এবং পঞ্চমখানি "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য" প্রণীত। এই পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইবার পর হিন্দুসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। পণ্ডিত-মহল হইতে অনেকে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রতিবাদের উত্তরে কয়েকখানি পুস্তক বেনামীতে প্রচারিত

হইয়াছিল এবং সেগুলির রচয়িতা যে বিদ্যাসাগর স্বয়ং, এরূপ প্রসিদ্ধিও চলিয়া আসিতেছে।

অন্তর্লীন প্রমাণের সাহায্যে এই বেনামী পুস্তকগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত মনে করা অসঙ্গত নহে। পুস্তকগুলির সব কয়খানিই বিদ্যাসাগরের "সংস্কৃত যন্ত্রে" মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত দুই জন সমসাময়িক ব্যক্তির স্মৃতিকথাতেও এই বেনামী পুস্তকগুলির রচয়িতা যে বিদ্যাসাগর স্বয়ং, তাহা স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে।

১। **অতি অল্প হইল।** এপ্রিল ১৮৭৩।

২। **আবার অতি অল্প হইল।** আগস্ট ১৮৭৩।

৩। **ব্রজবিলাস।** সেপ্টেম্বর ১৮৮৪।

৪। **বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা।** অক্টোবর ১৮৮৪।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে এই পুস্তিকার নামকরণ হয়—'বিনয় পত্রিকা'।

৫। **রত্নপরীক্ষা।** জুলাই ১৮৮৬।

(গ) রচিত প্রবন্ধাদি

বাল্যবিবাহের দোষ :—

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সর্ব্বশুভকরী' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (ভাদ্র, শকাব্দাঃ ১৭৭২) এই নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

'নীতিবোধ' :—

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই (১৯০৮ সংবৎ, ৪ শ্রাবণ) মাসে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীতিবোধ' পুস্তকের অনেকাংশ বিদ্যাসাগরের

রচিত। তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন; অবকাশ-অভাবে শেষে রাজকৃষ্ণবাবুকেই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিবার ভার দেন। পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয়,—এই কয়টি প্রস্তাব তাঁহারই রচিত। "প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণস্বরূপ যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির কথাও তাঁহার রচনা"।

'বামনাখ্যানম্' :—

মধুসূদন তর্কপঞ্চানন ১১৭টি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। কিন্তু "ভাষারচনায় তাদৃশ অভ্যাস" না থাকায় "শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট প্রার্থনা করাতে, তিনি শ্লোকগুলি বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত, ও ব্যয়স্বীকারপূর্ব্বক" পুস্তকখানি ১৭৯৫ শকে (ইং ১৮৭৩) মুদ্রিত করিয়া দেন।

প্রভাবতী সম্ভাষণ :—

ইহা 'সাহিত্যে' (বৈশাখ ১২৯৯) প্রকাশিত হয়।

'সখা' :—

এই শিশু-পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের দুইটি অপ্রকাশিত রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাদের প্রথমটি "মাতৃভক্তি"—জর্জ ওয়াশিংটনের কথা, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যায়, এবং দ্বিতীয়টি "ছাগলের বুদ্ধি" ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

শব্দ-সংগ্রহ :—

বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবদ্দশায় বহু বাংলা প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই শব্দ-সংগ্রহ ১৩০৮ সালের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (২য় সংখ্যা, পৃ. ৭৪-১৩০) প্রকাশিত হয়।

'রামের অধিবাস' :—

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর 'রামের রাজ্যাভিষেক' নামে একখানি পুস্তক রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময় শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এফ. আর. জি. এস.-প্রণীত ঐ নামে একখানি পুস্তক বাহির হওয়ায় (৩ আশ্বিন ১৯২৬ সংবৎ) বিদ্যাসাগর ঐ পুস্তক-রচনা হইতে বিরত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন "মধ্যে, পিতৃদেব লিখিত অংশ সন্নিবেশিত করিয়া, আদিতে, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত রামচন্দ্রের সিদ্ধাশ্রম গমন ও বিবাহান্তে অযোধ্যা প্রতিগমন; এবং শেষে, তাঁহার অধিবাস ও রাজা দশরথের, কেকয়ীর সহিত বাদানুবাদের পর, বনপ্রস্থান পর্য্যন্ত, উপাখ্যান সঙ্কলিত করিয়া, এবং 'রামের অধিবাস' নাম দিয়া, পুস্তকখানি প্রকাশিত" করেন (ইং ১৯০৯)। ঐ পুস্তকের ৬৮-৮৬ পৃষ্ঠা বিদ্যাসাগরের রচনা।

(ঘ) সম্পাদিত

১। **অন্নদামঙ্গল,** ১ম ও ২য় খণ্ড। ইং ১৮৪৭।

"কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূলপুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত"।

২। **বৈতাল পচ্চীসী।** জানুয়ারি ১৮৫২।

ইংরেজী ভূমিকা সম্বলিত হিন্দী গ্রন্থ।

৩। **রঘুবংশম্।** জুন ১৮৫৩।

৪। **কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।** ইং ১৮৫৩।

৫। **সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ।** ইং ১৮৫৩-৫৮।

৬। **শিশুপালবধ।** ইং ১৮৫৭।

৭। **কুমারসম্ভব**। ইং ১৮৬১।

৮। **কাদম্বরী**। ইং ১৮৬২।

৯। **বাল্মীকি রামায়ণ**, সটীক।

১০। **মেঘদূতম্**। এপ্রিল ১৮৬৯।

১১। **উত্তরচরিতম্**। আগস্ট ১৮৭০।

১২। **অভিজ্ঞানশকুন্তলম্**। জুন ১৮৭১।

১৩। **হর্ষচরিতম্***। নবেম্বর ১৮৮২।

(ঙ) গ্রন্থাবলী

মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতির পক্ষে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক বিদ্যাসাগরের সমগ্র রচনাবলী 'সাহিত্য' (ফাল্গুন ১৩৪৪), 'সমাজ' (ফাল্গুন ১৩৪৫) এবং 'শিক্ষা ও বিবিধ' (চৈত্র ১৩৪৬)— এই তিন খণ্ডে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশকালে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যা 'সখা'য় প্রকাশিত "ছাগলের বুদ্ধি" নামে বিদ্যাসাগরের একটি রচনা বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সম্প্রতি সেই রচনাটি শ্রীযুক্ত গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। রচনাটি নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

* 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে যে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থপঞ্জী দিয়াছি, তাহাতে ভুলক্রমে ইহার প্রকাশকাল "১৮৮৩" মুদ্রিত হইয়াছে।

ছাগলের বুদ্ধি

এক ওয়েল্‌স্‌দেশীয় ভদ্রসন্তান ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া, সুরাপানে অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিলেন। প্রতি দিন সময় বিশেষে শুঁড়ীর দোকানে গিয়া, বিলক্ষণ সুরাপান করিয়া আসিতেন।

এই ব্যক্তি একটি ছাগল পুষিয়াছিলেন। ছাগলটি, ক্রমে ক্রমে, তাঁহার অতিশয় অনুগত হইয়াছিল। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে যাইত। সুরাপানের জন্যে, যখন তিনি শুঁড়ীর দোকানে যাইতেন, সে সময়েও ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে যাইত। যখন তিনি সুরা লইতেন এবং সুরা লইয়া পান করিতেন, সে সময়ে সে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। ফলতঃ, ছাগলটি এক দিনের জন্যেও তাঁহার কাছ ছাড়া হইত না।

এক দিন তিনি কিঞ্চিৎ সুরা লইয়া ছাগলটির সম্মুখে ধরিলে, ছাগলটি আগ্রহ সহকারে পান করিল। সে অন্যান্য দিন যেরূপ স্বচ্ছন্দে আহার বিহার প্রভৃতি করিত, সুরাপান নিবন্ধন নেশায় অভিভূত হইয়া, সেদিন সেরূপ করিতে পারিল না।

পরদিন যখন তিনি সুরাপান করিতে যান, ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে গেল। কিন্তু অন্যান্য দিনের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে দোকানের ভিতরে না গিয়া, কিঞ্চিৎ অন্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি বারংবার ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই দোকানের ভিতরে গেল না। অনন্তর তিনি নিজে পান করিয়া ছাগলকে পান করাইবার জন্য, কিঞ্চিৎ সুরা লইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র, সে কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিছুতেই ছাগলকে সুরাপান করাইতে পারিলেন না।

এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ছাগল একবার মাত্র সুরাপান করিয়া, সুরাপানে

কত অসুখ ও কত অনিষ্ট হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, এবং তজ্জন্য এত পীড়াপীড়িতেও কোনও মতে আর সুরাপানে সম্মত হইতেছে না। আমি সুরাপানের দোষ বুঝিতে পারিয়াছি, অথচ সুরাপানে ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। অতএব বুদ্ধি ও বিবেচনা বিষয়ে আমি পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া জীবনধারণ অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া, প্রাণান্ত ঘটে, তাহাও স্বীকার, তথাপি আর কদাচ সুরাপান করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই দিন অবধি তিনি সুরাপান পরিত্যাগ করিলেন।

চারিত্রিক বিশেষত্ব

বিদ্যাসাগরকে বুঝিতে হইলে তাঁহাকে শুধু এক দিক্ দিয়া দেখিলে চলিবে না, সমগ্রভাবে দেখিতে হইবে। "দয়ার সাগর" বিদ্যাসাগরের করুণার কথা সকলেই জানেন। ওলাউঠা রোগে মুমূর্ষু রোগী পথে পড়িয়া আছে, বিদ্যাসাগর তাহাকে কোলে করিয়া ঘরে আনিয়াছেন, অপরিচিতের দুঃখে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশাতীত সাহায্য করিয়াছেন, বহু অনাথা বিধবার প্রতিপালনে এবং অসংখ্য দরিদ্র ছাত্রের বই কাপড় ও মাহিনা যোগাইতে মাসে মাসে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন,—এইরূপ বহু কথা সকল জীবনীকারই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল কাহিনী হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণ যে কত বড়, তাহা জানিতে পারি। ফরাসী দেশ হইতে কাতরভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কবি মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগরের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে বলিতেছেন,—"যাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি, প্রাচীন ঋষির জ্ঞান ও প্রতিভা, ইংরেজের কর্ম্মশক্তি, এবং বাঙালী মায়ের হৃদয়

দিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব গঠিত।"* সত্যই বিদ্যাসাগরের হৃদয় বাঙালী মায়ের মতই কোমল ছিল। তিনি কাহারও কষ্ট, কাহারও ব্যথা দেখিতে পারিতেন না, তখনই তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। তাই বিধবার অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণার প্রতিকারকল্পে তিনি নিজের সকল শক্তি, সকল জ্ঞান প্রয়োগ করিয়াছিলেন। করুণ এবং উদারহৃদয় জনহিতৈষী ও সমাজসংস্কারকরূপে ঈশ্বরচন্দ্র সকলের নিকটই সুপরিচিত। এই দিক্ দিয়া বিদ্যাসাগরের মহৎ জীবনের যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে, আমরা সে-সম্বন্ধে বেশী কথা বলি নাই। শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব কতটা এবং গ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্পাদনে তিনি কিরূপ শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন, সেই কথাই আমরা বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি, এবং এ-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যে-সকল সরকারী এবং বে-সরকারী চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারও পূর্ণ বিবরণ দিয়াছি। এই সকল চিঠি-পত্রের মধ্যে আমরা বিদ্যাসাগরের চরিত্রের আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'বিদ্যাসাগর-চরিতে'র উপসংহারে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, সর্ব্বাগ্রে তাহাই মনে পড়িতেছে,—

> তিনি গতানুগতিক ছিলেন না, তিনি স্বতন্ত্র, সচেতন, পারমার্থিক ছিলেন ; শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার জুতা তাঁহার নিজেরই চটি জুতা ছিল। আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল্ কেহ ছিল না, তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সবলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতি দিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য সে আর

* "The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman, and the heart of a Bengali mother."

উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বস্‌ওয়েল্ না থাকিলে জন্‌সনের মনুষ্যত্ব লোকসমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না। সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব তাঁহার কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাখিয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার অসামান্য মনস্বিতা, যাহা তিনি অধিকাংশ সময়ে মুখের কথায় ছড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা কেবল অপরিস্ফুট জনশ্রুতির মধ্যে অসম্পূর্ণ আকারে বিরাজ করিবে।

স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেই চটি জুতার কথা বলিতে গিয়াই লিখিয়াছেন,—

মানব-চরিত্রের প্রভাব যে কি জিনিস, উগ্র-উৎকট-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন তেজীয়ান্ পুরুষগণ ধনবলে হীন হইয়াও যে সমাজমধ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, তাহা আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া জানিয়াছি। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, যাঁহার পিতার দশ বার টাকার অধিক আয় ছিল না, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সময় অর্দ্ধাশনে থাকিতেন, তিনি এক সময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গসমাজকে কিরূপ কাঁপাইয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে মন বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়। তিনি এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতাশুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।" আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনি ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগণ্য ব্যক্তির মধ্যে।

মহতের চরণশোভিত এই চটিজুতা-মাহাত্ম্যই এই দরিদ্র, লাঞ্ছিত, আত্মবিস্মৃত জাতির মনে অনেক আশার সঞ্চার করিয়াছে, আমরা মরিতে মরিতেও বাঁচিয়া আছি। প্রতিভার সহিত, সাহিত্য-বুদ্ধির সহিত এই অসাধারণ চারিত্রিক তেজস্বিতা ও ব্যক্তিত্ব যুক্ত হইয়াছিল

বলিয়া 'বর্ণপরিচয়,' 'বোধোদয়,' 'কথামালা,' 'আখ্যানমঞ্জরী,' 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি,' 'শকুন্তলা,' 'সীতার বনবাসে'ই তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ নয়; বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধ চেষ্টা এবং বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তনের বিরাট্ কীর্ত্তিও তাঁহার পর্য্যাপ্ত পরিচয় নয়। সকল গুণ মিলাইয়া তিনি এ সকলের অনেক ঊর্দ্ধে ছিলেন; এই নিরস্তপাদপ এরণ্ডের দেশে তিনি একক ন্যগ্রোধ-মহিমায় বিরাজিত ছিলেন; শাখা-প্রশাখা-সম্বলিত বটবৃক্ষের বিশালতায় সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে তিনি আপনাকে উৎসারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরাট্ত্বের পরিমাপ করিতে পারে, এমন সমসাময়িক প্রতিভাও কেহ ছিলেন না। আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে দূর হইতে আমরা তাঁহাকে তাঁহার সম্পূর্ণ মহিমায় প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি, এই অঘটন কেমন করিয়া ঘটিয়াছিল! পল্লীগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরের সন্তান কোন্ প্রতিভাবলে এমন জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জ্জন করিলেন, যাহাতে সমসাময়িক সকল সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কারকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করিতে তিনি দ্বিধা করিলেন না, দৃঢ়হস্তে সকল বাধা অপসারিত করিতে অগ্রসর হইলেন! পাঠ্য পুস্তক ছিল না, পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে বসিলেন, দিকে দিকে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া জাতীয় উন্নতির মূল দৃঢ় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অন্তঃপুরে শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের কাজে অগ্রণী হইলেন। এই সংস্কারমুক্ততা, এই সাহস এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর এই নির্ভরশীলতা তাঁহার মধ্যে কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল! তাঁহার পারিবারিক ইতিহাসের মধ্যে—রামজয়-ঠাকুরদাস-ভগবতীর মধ্যে, মেদিনীপুর-বীরসিংহের মধ্যে অথবা সমসাময়িক ঘটনাবলীর মধ্যে এই সমস্যার সমাধান নাই। বাংলা দেশের সকল অভাবনীয়ের মত ১২২৭ বঙ্গাব্দের ১২ই আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০) মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরে

মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাবও আকস্মিক; আমরা সৌভাগ্যবান্ যে, এই আকস্মিকতার ফলভোগ আজিও করিতেছি।

বিদ্যাসাগর যাহা ধরিতেন, তাহা ঐকান্তিকভাবে সম্পন্ন করিতেন। বাধা-বিঘ্ন, বিরোধ, অভাব তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার গুরু ভার যখন তিনি স্কন্ধে বহন করিতেছেন, নিজের দায়িত্বে তখন তিনি গ্রামে গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ভারত-সরকারের শেষ সম্মতির জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক তিনি ছিলেন না। সরকার এ-বিষয়ে তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে অবশেষে সম্মত হইলেও তাঁহাকে যে যথেষ্ট ভুগিতে হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবুও স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে তাঁহার আগ্রহ কিছুমাত্র কমে নাই।

নারীর প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া নারীজাতির উন্নতি ও দুঃখ লাঘবের জন্য সকল অনুষ্ঠানে তিনি অগ্রণী ছিলেন। বিধবাবিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া বীটন-কলেজের প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত যে-কোনও কার্য্য তাহার উদাহরণ।

এক দিকে তাঁহার প্রকৃতি যেমন বলিষ্ঠ ছিল, অন্য দিকে তাঁহার স্বভাব ছিল তেমনই কোমল ও সরল। তাই শত্রু-মিত্র সকলেরই তিনি প্রশংসাভাজন ছিলেন।

নানারূপ সমাজ-সংস্কারে হাত দিলেও বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে তিনি কখনও সাহেবদের নকল করেন নাই।—

> ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ, তখন

তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেই সঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। শাদা ধুতি ও শাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্ত্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণ চর্ম্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না।—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: "বিদ্যাসাগর-চরিত", 'সাধনা', ভাদ্র ১৩০২, পৃ. ৩৩৯।

সামাজিক বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ঔদার্য্য ছিল। কাহাকেও তিনি ঘৃণা করিতেন না, কাহাকেও তিনি হীন বলিয়া মনে করিতেন না। সকলের সহিত তিনি সমানভাবে মিশিতেন, বড়লোক ছোটলোক অথবা উচ্চ জাতি নীচ জাতি বাছিতেন না। নিজেকেও তিনি কাহারও কাছে খাটো করিতেন না। যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, তাহার সহিত তিনি বন্ধুবৎ আচরণ করিতেন, এবং যে তাঁহার প্রতি অসম্মানের সহিত ব্যবহার করিত, ইংরেজ অথবা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হইলেও তিনি তাহার প্রতি অনুরূপ আচরণ করিতে ছাড়িতেন না।

সামাজিক আচরণে ঈশ্বরচন্দ্রের কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা ছিল না। ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও তাঁহার কোনরূপ গোঁড়ামি ছিল না। সব জিনিস তিনি যুক্তি দিয়া পরখ করিতেন। 'শাস্ত্রে আছে'—ইহাই তাঁহার কাছে শেষ কথা ছিল না। তাঁহার মতামত খুব স্পষ্ট ছিল। এমন কি, বেদান্তকে তিনি ভ্রান্ত দর্শন বলিতেন।

তিনি নিজের কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন। সমাজ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি বড়-একটা যোগ দিতেন না।

কিন্তু শিক্ষা ও সমাজ-সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি নিজের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

ছেলেরা ভবিষ্যতে যাহাতে ভাল বাংলা লেখক ও সাহিত্যস্রষ্টা হইতে পারে, তিনি এমনভাবে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের গড়িতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, সংস্কৃত ও ইংরেজী, এই উভয় ভাষায় ভালরূপ ব্যুৎপত্তি না জন্মিলে, কেহ ভাল বাংলা লেখক হইতে পারে না। তাই ইংরেজী গদ্যের প্রসাদগুণ এবং সংস্কৃতের ভাষাসম্পদ্ তাঁহার রচনায় পরিস্ফুট।

বিদ্যাসাগরের আর একটি গুণ ছিল—তাঁহার লোক-নির্ব্বাচনের অদ্ভুত ক্ষমতা। এই গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সহজ হইয়াছিল। দু-একটি উদাহরণ দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সুবিখ্যাত সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে (১৪ জুন ১৮৬১) তাঁহার নিঃসহায় পরিবারবর্গের মুখ চাহিয়া, বিদ্যাসাগরের অনুরোধে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ পাঁচ হাজার টাকা দিয়া কাগজখানি ও ছাপাখানার সমস্ত সরঞ্জাম কিনিয়া লন। হরিশবাবুর মৃত্যুর পর শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতি অল্প দিন মাত্র কাগজখানির সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। শেষে সিংহ-মহাশয় কাগজ চালাইবার সমুদয় ভার বিদ্যাসাগরের হাতে দেন।

> এই মাহেন্দ্র যোগে কৃষ্ণদাস পালের উপর বিদ্যাসাগরের দয়া হইল। কৃষ্ণদাসকে ডাকাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু পেট্রিয়ট চালাইতে অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণদাস তখন বালক। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণদাসের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া নিজের ইচ্ছানুরূপ প্রবন্ধাদি তাঁহাকে দিয়া লিখাইয়া লইয়া, হিন্দু পেট্রিয়ট চালাইতে লাগিলেন।...কৃষ্ণদাস এইরূপে কিয়দ্দিনের জন্য বিদ্যাসাগরের অধীনে

থাকিয়া হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকের কার্য্য করেন। এ কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়া শেষে বলিয়া দিয়াছিলেন।... কৃষ্ণদাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকতা প্রাপ্ত হন। বিদ্যাসাগরের এই অনুগ্রহ না হইলে হয়ত কৃষ্ণদাসকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় চাকরি করিয়া জীবন শেষ করিতে হইত।—রামগোপাল সান্যাল : "কৃষ্ণদাস পালের জীবনী" (১৮৯০), পৃ. ২৭-৩০।

দেখা যাইতেছে, বিদ্যাসাগরের লোক চিনিতে ভুল হয় নাই। 'সোমপ্রকাশ' বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথম বাহির করেন (নবেম্বর ১৮৫৮)। তখনকার দিনে এরূপ উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র ছিল না। যাহা ছিল, তাহাতে রাজনৈতিক বিষয়, অথবা ধীরভাবে কোন সামাজিক বা ধর্ম্মনৈতিক বিষয় আলোচিত হইত না। অল্প দিন পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের হস্তে 'সোমপ্রকাশে'র ভার অর্পণ করেন। এখানেও তাঁহার বিবেচনায় কোন ভুল হয় নাই।

বিদ্যাসাগর অত্যন্ত সদালাপী ছিলেন। লোকে তাঁহার কথাবার্ত্তা মুগ্ধ হইয়া শুনিত। রসিকতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মানুষের অকৃতজ্ঞতায় জীবনের অপরাহ্নে তাঁহার মনটা তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। "সে আমার নিন্দে করলে কেন, আমি ত তা'র কোন উপকার করি নি"—এইরূপ তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ কথা তাই তাঁহার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতে শুনিতে পাই।

বিদ্যাসাগরের কর্ম্মশক্তি ছিল অপূর্ব্ব। কর্ম্মের মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রতিভা স্ফূর্ত্ত হইত। তিনি ভাবুকের ন্যায় শুধু স্বপ্ন দেখিতেন না,—তিনি কাজের লোক ছিলেন। তাই যে-কাজ অন্যের কাছে প্রায় অসম্ভব ছিল, সেই কাজকেই তিনি সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আমরা তাঁহার সমস্ত জীবনের কার্য্যাবলী একটু ধীরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, এক দিক্ দিয়া তিনি যেমন সঙ্কল্পে অটল দৃঢ়চিত্ত পুরুষ ছিলেন, অন্য দিকে তেমনই পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দূরদর্শিতার সহিত সমস্ত কাজ করিতেন। সঙ্কল্পে এক তিল বিচ্যুত না হইয়াও তাঁহাকে 'গোঁয়ার' অপবাদ শুনিতে হয় নাই। অন্যায়ের সমর্থনে তিনি কখনও জিদ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু যেখানে তিনি স্বীয় কার্য্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতেন, সেখানে কিছুতেই কেহ তাঁহাকে টলাইতে পারিত না। প্র্যাট সাহেবের বিদায়গ্রহণের পরও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যখন স্কুল-ইনস্পেক্টরের পদ দেওয়া হইল না, তদানীন্তন লেফ্‌টনাণ্ট-গবর্নর হ্যালিডে সাহেবের অনুরোধ সত্ত্বেও তখন তিনি পদত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত বিবাদেও তাঁহার বিশেষ স্বাধীনচিত্ততা প্রকাশ পাইয়াছিল। সকল বাধা অতিক্রম করিয়া বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তন তাঁহার দুর্জ্জয় দৃঢ়চিত্ততার আর একটি উদাহরণ। দেশের সমগ্র রক্ষণশীল শক্তি সংহত হইয়াও তাঁহাকে দমাইতে পারে নাই। পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে তিনি সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন,—

> বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নই।···আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।

নিজের রচনা ছাড়াও অপরকে বাংলা-সাহিত্যের সাধনায় উৎসাহিত করিয়াও তিনি 'বঙ্গবীণাপাণির ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছেন;

অক্ষয়কুমার দত্ত ও মধুসূদন দত্তের সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অযাচিত উৎসাহ কতখানি কাজ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। 'তত্ত্ববোধিনী,' 'সর্ব্বশুভকরী' প্রভৃতি বাংলা সাময়িক-পত্র তাঁহার সর্ব্ববিধ পোষকতা লাভ করিয়াছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনিই প্রথম 'সোমপ্রকাশ' নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতাও সর্ব্বজনবিদিত। সাহিত্য, সমাজ ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে ঊনবিংশ শতাব্দীতে অপর কোনও এক ব্যক্তিকে এতখানি পরিশ্রম করিতে দেখা যায় নাই।

বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় সেকালের পণ্ডিতকুলের অগ্রগণ্য হইলেও তাঁহার মত প্রগতিশীল আধুনিক মন লইয়া কেহ সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কারে ব্রতী হন নাই। তিনি নিয়মনিষ্ঠা ভালবাসিতেন, ইংরেজী শিক্ষার পোষকতা করিতেন, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দেই বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করিতে ভীত হন নাই; বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন; বহুবিবাহ সমর্থন করিতে পারেন নাই। যে তত্ত্ববোধিনী সভাকে সেকালে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় শুধু সৎপরামর্শ নয়, নিয়মিত অর্থসাহায্য—এমন কি, সম্পাদকের কার্য্য করিয়া সেই সভার পোষকতা করিতেন।

১৮২৯ হইতে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ণ এক যুগ কাল সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি ও ন্যায় অধ্যয়ন করিয়া এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান হইয়া তিনি যে কেমন করিয়া এই সংস্কারমুক্ততা অর্জ্জন করিলেন, তৎকাল-প্রচলিত জ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে এই উদারতার বীজ কোথায় কেমন ভাবে তাঁহার মনে উপ্ত হইল, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও তাহার রহস্য আমাদিগকে অভিভূত করে:

আসলে বিদ্যাসাগর মহাশয় দেবত্ব ও ব্রহ্মণ্যের সকল গৌরব-বর্জ্জিত ভাবে মানুষকে মানুষরূপেই মহৎ ও মহনীয় দেখিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহা চাহিয়াছিলেন বলিয়াই এই গুরু ও শালগ্রামশিলার দেশে তাঁহাকে অপরিসীম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অকারণ আঘাতে আঘাতে তাঁহার ফুলের মত কোমল মন পাষাণ-কঠোর হইয়া উঠিয়াছে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করিয়াছেন, কিন্তু এই অসহায় নিপীড়িত সমাজের জন্য তাঁহার কল্যাণ-হস্তকে নিরস্ত করেন নাই; বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই মানব-প্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বস্তু।

এই বিরাট্ পুরুষ বিদ্যাসাগরের জীবন-কাহিনী আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি দিয়া শেষ করিতেছি,—

> বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বন-জঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে—বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশঃই শব্দহীন সুদূর নির্জ্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন; কিন্তু আমাদের শত সহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত পীড়িত অনাথ অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্ত্তমান নাই,—কিন্তু তাঁহার মহান্ চরিত্রের যে অক্ষয়বট বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালী জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল, সবল, অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি, এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মত, দুর্গম বিস্তীর্ণ

কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য্যবীর্য্য মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব, যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

—'সাধনা', ভাদ্র ১৩০২।

সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

১৮২০, ২৬ সেপ্টেম্বর···বীরসিংহে জন্ম (১২ আশ্বিন ১২২৭, মঙ্গলবার)।

১৮২৯, ১ জুন ···কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ।

১৮৩৯, ২২ এপ্রিল ···হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষাদান; পরবর্ত্তী ১৬ মে তারিখে প্রশংসাপত্র লাভ।

১৮৪১, ৪ ডিসেম্বর ···কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে বার বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর কলেজের এবং অধ্যাপকবর্গের দুইখানি প্রশংসাপত্র লাভ।

২৯ ডিসেম্বর ···ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিত।

১৮৪৬, ৬ এপ্রিল ··সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

১৮৪৭ ··সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি প্রতিষ্ঠা।

এপ্রিল ···প্রথম গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রকাশ।

১৬ জুলাই ··তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে কার্য্য বুঝাইয়া দিয়া সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদ হইতে বিদায় গ্রহণ।

১৮৪৯, ১ মার্চ ··ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ।

১৮৫০, আগষ্ট ···'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' প্রকাশ।

৫ ডিসেম্বর ···সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক।

ডিসেম্বর ··বীটন নারী-বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক।

১৮৫১, ৫ জানুয়ারি···সাহিত্যের অধ্যাপক ও সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সেক্রেটরী।

২২ জানুয়ারি···সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। এই সময় হইতে কলেজে সেক্রেটরীর পদ লুপ্ত হয়।

৯ জুলাই ...ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া, সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-সন্তানকে কলেজে প্রবেশাধিকার দান।

২৬ জুলাই ...অষ্টমী ও প্রতিপদের পরিবর্ত্তে কেবল রবিবার সংস্কৃত কলেজ বন্ধ রাখিবার রীতি প্রচলন।

ডিসেম্বর ...যে-কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দুসন্তানকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার দান।

১৮৫২, ২৮ আগষ্ট ...সংস্কৃত কলেজে প্রবেশার্থী ছাত্রদের দুই টাকা দক্ষিণা দিবার রীতি প্রচলন।

১৮৫৩ ...বীরসিংহে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৫৪, জানুয়ারি...বোর্ড অব একজামিনার্সের সদস্য।

জুন ...সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের মাসিক ১৲ বেতন গ্রহণের রীতি প্রচলন।

১৮৫৫, ১ মে ...অধ্যক্ষ-পদ ছাড়া দক্ষিণ-বাংলা স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের পদ। বেতন-বৃদ্ধি—মাসিক ২০০৲।

১৭ জুলাই ...নর্মাল স্কুল স্থাপন ও অক্ষয়কুমার দত্তকে প্রধান শিক্ষক-রূপে গ্রহণ।

আগষ্ট-সেপ্টেম্বর...নদীয়ায় পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন।

আগষ্ট-অক্টোবর...বর্দ্ধমানে পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন।

আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, নবেম্বর...হুগলীতে পাঁচটি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা।

অক্টোবর-ডিসেম্বর...মেদিনীপুরে চারিটি মডেল স্কুল স্থাপন।

৪ অক্টোবর...বিধবাবিবাহ-বিধির জন্য সরকারের নিকট আবেদনপত্র।

২৭ ডিসেম্বর ...বহুবিবাহ রহিত করণের জন্য সরকারের নিকট আবেদনপত্র।

১৮৫৬, ১৪ জানুয়ারি...মেদিনীপুরে আর একটি মডেল স্কুল স্থাপন।

১৬ জুলাই ...বিধবাবিবাহ-বিধি বিধিবদ্ধ হয়।

৭ ডিসেম্বর ...প্রথম বিধবাবিবাহ। বর—প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন; কন্যা—পলাশডাঙ্গা গ্রামনিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দ্বাদশ-বর্ষীয়া বিধবা কন্যা কালীমতী।

১৮৫৭, নবেম্বর-ডিসেম্বর...হুগলী জেলায় সাতটি ও বর্দ্ধমানে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৫৮, জানুয়ারি-মে...হুগলী জেলায় আরও তেরটি (তন্মধ্যে বীরসিংহে একটি), বর্দ্ধমানে দশটি, মেদিনীপুরে (ভাঙ্গাবন্ধ, বদনগঞ্জ ও শান্তিপুরে) তিনটি এবং নদীয়ায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন।

...তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক।

৩ নবেম্বর ...সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ ত্যাগ।

১৫ নবেম্বর ...'সোমপ্রকাশ' পত্র প্রকাশ।

১৮৫৯, ১ এপ্রিল ...কাঁদী (মুর্শিদাবাদ) ইংরেজী-বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা।

২৩ এপ্রিল ...রামগোপাল মল্লিকের সিঁদুরিয়াপটী বাটীতে 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের অভিনয় দর্শন।

১৮৬১, এপ্রিল ...কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের সেক্রেটরী।

১৮৬৩, নবেম্বর ...ওয়ার্ডস ইন্‌ষ্টিটিউশনের পরিদর্শক।

১৮৬৪ ...'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' নামের পরিবর্ত্তে মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশন নামকরণ।

৪ জুলাই ...বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনরারি মেম্বর।

১৮৬৬, ১ ফেব্রুয়ারি...বহুবিবাহ রহিত করণের জন্য দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদনপত্র।

১৮৭০, জানুয়ারি...ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের বিজ্ঞান-সভায় সহস্র মুদ্রা দান।

১১ আগষ্ট ...জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিধবার বিবাহ দান।

১৮৭১, ১২ এপ্রিল …কাশীতে মাতার মৃত্যু।

১৮৭২, ১৫ জুন …হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্যুয়িটি ফণ্ডের ট্রাষ্টি।

১৮৭৩, জানুয়ারি…মেট্রোপলিটান কলেজ।

নবেম্বর (?) ··মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের শ্যামপুকুর-শাখা।

১৮৭৫, ৩১ মে …সম্পত্তির উইলকরণ।

১৮৭৬, ২১ ফেব্রুয়ারি…হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্যুয়িটি ফণ্ডের ট্রাষ্টি-পদ ত্যাগ।

১২ এপ্রিল …পিতা ঠাকুরদাসের কাশীলাভ।

…কলিকাতা বাদুড়বাগানের বাটী নির্ম্মাণ।

১৮৭৭, এপ্রিল …গোপাললাল ঠাকুরের বাটীতে বড়লোকের ছেলেদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা,—ছাত্রদের বেতন মাসিক ৫০৲।

১৮৮০, ১ জানুয়ারি…সি. আই. ঈ. উপাধিলাভ।

১৮৮৫ …মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের বড়বাজার-শাখা।

১৮৮৭, জানুয়ারি…শঙ্কর ঘোষের লেনে নবনির্ম্মিত বাটীতে মেট্রোপলিটান কলেজের গৃহপ্রবেশ।

…মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের বউবাজার-শাখা।

১৮৮৮, ১৩ আগষ্ট …পত্নী দিনময়ীর মৃত্যু।

১৮৯০, ১৪ এপ্রিল …বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৯১, ২৯ জুলাই …কলিকাতায় মৃত্যু। (১৩ শ্রাবণ ১২৯৮, রাত্রি ২-১৮ মিনিট)

কাউন্সিল অফ এডুকেশনকে লিখিত বিদ্যাসাগরের পত্র

In reply I beg leave to state that I am very happy to observe that all the measures lately introduced into this institution have met with the entire approbation of a man of Dr. Ballantyne's talents and abilities.

With regard to the adoption of class-books recommended by Dr. Ballantyne, I regret to say I cannot agree with him on all points. He appears to recommend the adoption of his abstract of Mill's Logic in substitution of the original. Under the present state of things the study of Mill's work in the Sanskrit College is, I am of opinion, indispensable. Dr. Ballantyne's principal reason for recommending the abstract seems to be the high price of Mill's work. Our students are now in the habit of purchasing standard works at high prices. So we need not be deterred from the adoption of this great work on that consideration. Dr. Ballantyne's abstract might be read, to quote his own words, as introductory to the perusal of that work. But the great author himself, in his preface, strongly recommends Archbishop Whatley's treatise on Logic as the best introduction to his work. I, therefore, leave the matter to the decision of the Council. Dr. Ballantyne also recommends to adopt as class-books three text-books of each of the three systems of philosophy,—Vedanta, Nyaya, and Sankhya—printed with the English versions and notes. Of these the *Vedantasara*, text-book on Vedanta, is already a class-book here, and its version in English might be read

with advantage. The two other text-books recommended by him, the *Tarkasangraha*, the text-book on Nyaya, and the *Tattwasamasa*, that on the Sankhya, are very poor treatises in their own departments. We have better treatises in our curriculum. With regard to Bishop Berkeley's *Inquiry*, I beg to remark that the introduction of it as a class-book would beget more mischief than advantage. For certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankhya in the Sanskrit College. That the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy is no more a matter of dispute. These systems, false as they are, command unbound reverence from the Hindus. Whilst teaching these in the Sanskrit course, we should oppose them by sound philosophy in the English course to counteract their influence. Bishop Berkeley's *Inquiry*, which has arrived at similar or identical conclusions with the Vedanta or Sankhya and which is no more considered in Europe as a sound system of philosophy, will not serve that purpose. On the contrary, when, by the perusal of that book, the Hindu students of Sanskrit will find that the theories advanced by the Sankhya and Vedanta systems are corroborated by a philosopher of Europe, their reverence for these two systems may increase instead of being diminished. Under these circumstances, I regret I cannot agree with Dr. Ballantyne in recommending the adoption of Bishop Berkeley's work as a class-book.

I also beg leave to state that I cannot quite agree with Dr. Ballantyne when he admits that both the Sanskrit and English courses in the Calcutta Sanskrit College are good and yet desiderates sufficient provision for obviating the

danger that the two courses may end in persuading the learner that 'truth is double.' 'This danger,' says Dr. Ballantyne, 'is no chimerical one.' 'To take an example,' he continues, 'I am acquainted with Brahmans who being well-versed in Sanskrit literature and also familiar with English, are aware that the European theory of logic is correct, and also the Hindu theory, while at the same time they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the other.' I believe, the danger that Dr. Ballantyne apprehends is not so inevitable in the case of an individual who has intelligently studied both English and Sanskrit sciences and literatures. Truth is truth if properly perceived. To believe that 'truth is double' is but the effect of an imperfect perception of truth itself—an effect which I am sure to see removed by the improved courses of studies we have adopted at this institution. It must be considered as a singular circumstance if an intelligent student cannot perceive indentity of truths where there is real identity. Suppose students read logic or any other department of science or philosophy both in Sanskrit and English. If they be found to assert, 'that the European theory of logic is correct and also the Hindu theory, while at the same time, they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the other,' the hearer is naturally led to conclude that either they could not comprehend the subject with sufficient clearness, or that their familiarity with the language, in which they are found unable to express themselves, is not sufficient. It must be confessed, however, that there are many passages in Hindu